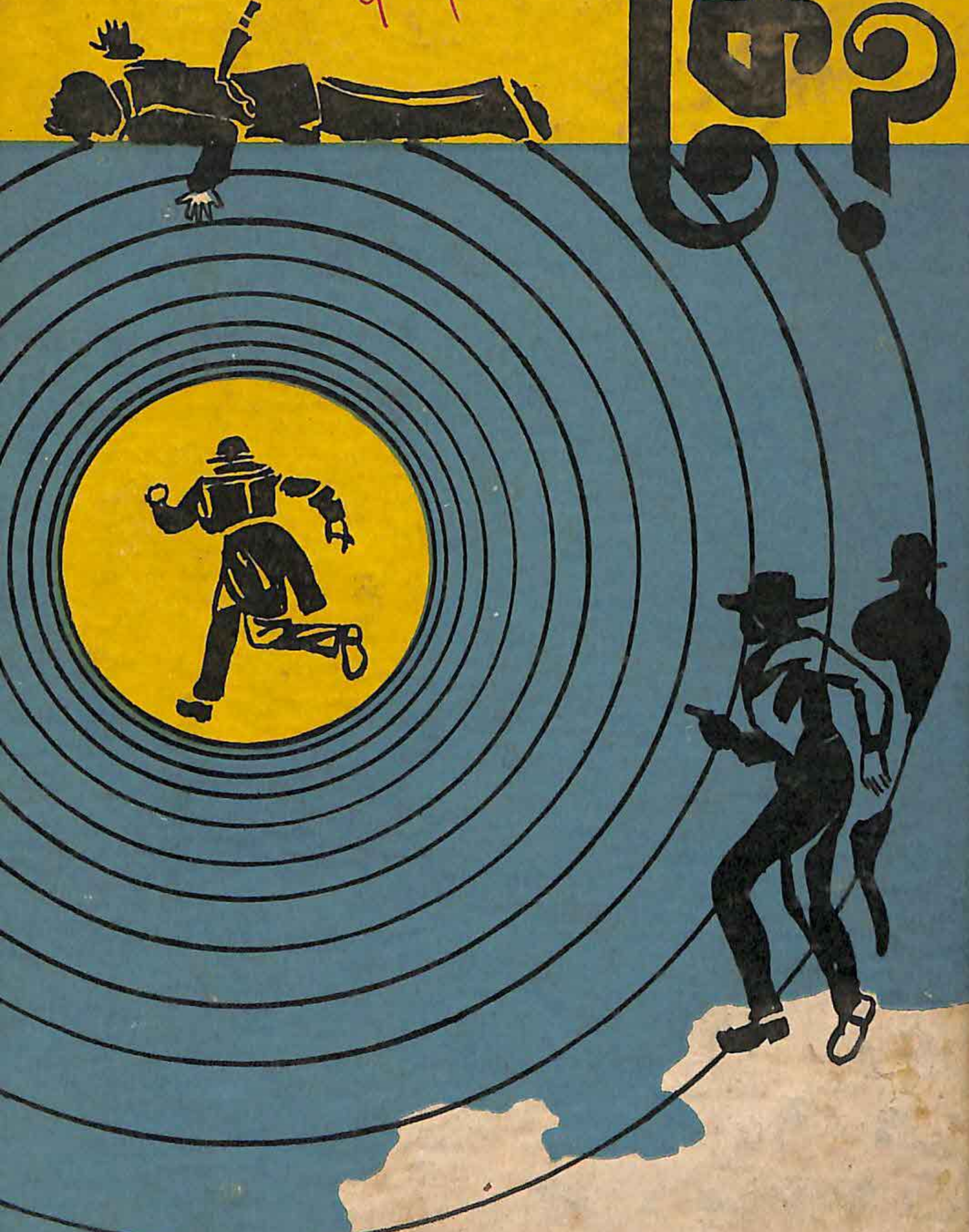
হত্যাকারী কে?



শিবরাম চক্রবর্তী

44

। প্রাইজ ও লাইব্রেরীর উপযোগী রহস্য গ্রন্থ ॥

হত্যাকারী কে ?

4'4

[রহস্যে ভরা লোমহর্ষক কাহিনী]

651

শিবরাম চক্রবর্তী

সিটি বুক এজেন্সী

প্রকাশক ও পরিবেশক

৪৪/১সি, বেনিয়াটোলা লেন

কলিকাতা—৯

নূতন প্রকাশ :
প্রকাশক :
পি, দে
৪৪।১সি, বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা—৯

মুদ্রণে :
নারায়ণচন্দ্র পাল
বাণীমালা প্রেস
৫৬, সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলিকাতা—৯

প্রচ্ছদ অঙ্কনে :
মাণিক সরকার

মূল্য :
দশ টাকা পঞ্চাশ পয়সা

কিছু বল্‌ছি—

আমার পেশা নাকি গল্প লিখিয়ে—তাও আবার হাসির—পান করে। হাসি কি পান করা যায়?—এটা নিছকই রহস্য। কিন্তু সেটা যখন এ রকম দাঁড়ায় পান অর্থে 'অলঙ্কার'—তখন?

আসলে হচ্ছে কি—রহস্য জিনিসটা যে কি সেটাই রহস্য। রহস্য আরও রহস্যময় হয়ে ওঠে তখনই যেখানে রহস্যের কিনারা সন্ধান করা কঠিন।

কিন্তু আমি কি সত্যিই রহস্যময়—না আমার লেখা রহস্যপূর্ণ। এ বিচার আপনাদের সকলের।

তাই এই রহস্যের সন্ধান আপনাদের হাতে।—যদি ধরা পড়ি শাস্তি দেবেন না কিন্তু—।

—লেখক

—এতে আছে—

হত্যাকারী কে?

রহস্যময় অট্টালিকা

হত্যাকারী কে ?

এক

॥ রহস্যময় খুন ॥

দৈনিক বিশ্ববার্তার মফস্বল-সংস্করণ তখন ছাপা হচ্ছিল। বিরাট মুদ্রাযন্ত্রের গহ্বর থেকে প্রতি মিনিটে পাঁচ হাজার করে কপি উদ্গীরিত হচ্ছে। কোন্ আশ্চর্য কৌশলে অতগুলি করে কপি আপনা থেকেই এপিঠে ওপিঠে ছাপা হয়ে, ভাঁজ হয়ে থাকে থাকে সজ্জিত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে বেরিয়ে আসছিল বাহাদুররাই তা বলতে পারেন।

প্রায় তিন মাইল পরিমাণ কাগজে প্রাত্যহিক বিশ্ববার্তা ছাপা হয়। কাগজগুলি পাশাপাশি ছড়িয়ে রাখলে তিন মাইল পরিমিত জায়গা জুড়ে বসবে। কিন্তু আসলে, ঐ তিন মাইল কাগজ তিন মাইলের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে সারা ভারতবর্ষে (কতো হাজার মাইল কে জানে !) ছড়িয়ে যায়। প্রত্যেকেই আমরা প্রাতঃকালীন চায়ের সঙ্গে বিশ্ববার্তা পড়ি, নতুবা চায়ের আস্বাদ পাই না।

বিশ্ববার্তার বাড়ীটিও একটা যা তা নয়। ঠিক তিন মাইলব্যাপী না হলেও, তিনতলা জুড়ে বড়ো বড়ো ত্রিশখানি ঘরে বিস্তারিত। কলকাতার কোনো এক নামজাদা রাজপথের ওপরেই এর কার্যালয়। এবং বলা বাহুল্য, বিশ্ববার্তার দৌলতেই রাস্তার এই নামডাক।

তুমি যদি বিশ্ববার্তার গহ্বরে কখনো প্রবেশ লাভ করো তাহলে দেখবে সবাই সেখানে শশব্যস্ত। দেউড়ির দারোয়ান থেকে সুরু করে ভেতরের কর্মচারীরা, কম্পোজিটাররা, সংবাদদাতারা, বিজ্ঞপন-দাতারা—সকলেই সর্বদা ইতস্ততঃ ধাবমান। সদরে অন্দরে

সমান দৌড়-ঝাঁপ। এমন কি, কাগজ ছেপে বেরুতে না বেরুতে হকাররা বগলদাবা করে নিয়ে দৌড় মারছে, তাও তুমি দেখতে পাবে। নিদারুণ কেনবার ইচ্ছা হলেও, তাদের কাউকে দাঁড় করিয়ে এক কপি কিনতে পারবে কিনা সন্দেহ।

উঃ, এত লোক কাজ করে বিশ্ববার্তায়! আর এতজন সেখানে যাতায়াত করে কাজে-অকাজে। ভাবলে আকুল হতে হয়। ধরো, তাদের সবাইকে যদি সারবন্দী দাড় করিয়ে দেয়া যায় (অবিশ্যি এভাবে দাড়াতে তাঁরা সহজে রাজি হবেন না), তাহলে সেই লাইন খুব সম্ভব সুন্দরবন ঘুরে আসবে। দুই লাইনে খাড়া করলে তার ডবল জায়গা ঘেরাও হতে পারে। আর যদি শোভাযাত্রা করে বার করা যায়, তাহলে ঢাকুরিয়া লেকের মাঝ বরাবর গিয়ে পৌঁছবে। এতদ্বারা অধিকাংশ নাগরিককে জলাঞ্জলি দিতে হয় বলে কলকাতার পুলিশ কমিশনার এই শোভাযাত্রার সম্ভবতঃ অনুমতি দেবেন না। কিন্তু, তা না দিলেও, এতেই ব্যাপারটা কেমন ঘোরালো তা হৃদয়ঙ্গম হবে।

এই মুহূর্তে এই বিরাট অট্টালিকায় কী দারুণ হৈ-চৈ! এই মুহূর্তে বলেই নয়—এটা প্রতিমুহূর্তের ব্যাপার। দিনে রাতে কখনো একটুক্ষণের জন্যও বিশ্ববার্তা-কার্যালয় চুপ্‌চাপ্‌ রয়েছে একথা ভাবতে পারা যায় না। তবে ঘরে ঘরে কর্ম-কোলাহল চললেও একটি ঘর নীরব, একদম ঠাণ্ডা। সেই ঘরটি বিশ্ববার্তার বড়কর্তার ঘর। যাঁর বুদ্ধিবলে এবং কর্মফলে বিশ্ববার্তা আজ বিশ্বের প্রায় সবচেয়ে বড় বার্তা হয়ে দাড়িয়েছে—বিশ্ববার্তার সমস্ত কিছু নির্ভর করছে যাঁর বিরাট স্কন্ধে সেই থরহরি দত্তর ঘরটিই কেবল চুপ্‌চাপ্‌।

সারা বাড়ীটিকে, বাড়ীর সবাইকে এবং সব কিছুকে কম্পমান করে' রাখলেও থরহরি নিজে নিষ্কম্প। শুধু নিষ্কম্প নন্‌, নিবাত-নিষ্কম্প। বাত তিনি খুব কমই বলেন। তাঁর মধ্যে কোনো ব্যস্ততা কোনো চাঞ্চল্য নেই। তাঁর বিরাট দেহ দেখলে মনে হয়

তাঁর মাথার ভেতরে যে বিরাট মস্তিষ্ককে তিনি অকাতরে বহন করছেন তা চারটিখানি না। কাজেই, উন্নত লোকরাও যে তাঁর কাছে এসে সহজেই অবনত হয়ে পড়বে তার আর বিচিত্র কি? তবে তাঁর মুখভাব দেখে তাঁর মনের মধ্যে প্রকাশ করা কারো সাধ্য নয়।

বড়কর্তা নিজের প্রকাণ্ড চেয়ারে বসেছিলেন। আর তাঁর টেবিলের চারধারে কাগজপত্রের ছড়াছড়ি। তাঁর ঐ টেবিলের ওপর দিয়েই বিশ্বের সমস্ত বার্তা বয়ে চলেছে—যেসব বার্তা সম্পাদকদের দ্বারা সম্পাদিত, মুদ্রাকরদের দ্বারা মুদ্রিত, হকারদের দ্বারা হৃত হয়ে বিশ্ববার্তারূপে পুনশ্চ আবার প্রবাহিত হবে। কিন্তু চেয়ারের ঐ মানুষটিকে সরিয়ে নাও, দেখবে বিশ্ববার্তা অচল; এমন কি আমাদের বিশ্বও অচল বলে তোমার ভ্রম হবে।

এই সময়ে আমাদের গল্পের যবনিকা উন্মোচিত হতে দেখা গেল (এর আগে এই যবনিকা উন্মোচনের কোনো অর্থ ছিল না)—দেখা গেল যে বড়কর্তা কি একটা সংবাদ গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করছেন।

তারবার্তা বেতারবার্তা কিম্বা টেলিফোন-বার্তা নয়, একটুকরো কাগজে হাতে লেখা একটা খবর। কিন্তু চোখ বুলোতেই চকিতের মধ্যে তিনি সংবাদের মর্ম বুঝতে পেরেছেন বলে বোধ হোলো।

"কী সর্বনাশ!" তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন।

এর চেয়ে বেশি কথা—তীব্রতর ভাষা থরহরির কণ্ঠ থেকে কেউ কখনো শোনেনি। এই নিরেট, আত্মনিষ্ঠ, স্বয়ংসৃষ্ট মানুষ এর অধিক বাক্যব্যয় খুব কদাচই করেছেন। এর চেয়ে বেশ লম্বা এবং বেশ শক্ত কথা তাঁর মুখ থেকে খসলে তাঁর ব্যক্তিত্বের মর্যাদাহানি ঘটত।

"কী সর্বনাশ।" তিনি পুনরুক্তি করলেন: কৃত্তিবাস খুন হয়েছে! নিজের বাড়ীতে! কী আশ্চর্য, কাল রাত্রে যে একসঙ্গে

আমরা খেলাম। আমি তাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে এসেছি আমার মোটরে!"

"তুমি যেতে পারো।" সংবাদদাতাকে তিনি বললেন। তারপরে টেলিফোনটা হাতে নিয়ে (একটুও চিন্তা না করে তিনি টেলিফোনের চোঙ হাতে নিতে পারতেন, এমন কি চিন্তা করতে করতেও টেলিফোন করার তাঁর অসাধারণ দক্ষতা ছিল)—চোঙ্‌টা হাতে নিয়ে, ঠাণ্ডা গলায়, কাটাকাটা কথায়—একটিও কথা বাজে বর্‌বাদ না করে বলতে স্বুরু করলেন:

"হ্যালো, অপারেটর! পুট মি থ্রু, টু—টু টু ফোর্‌। হ্যালো! কে? তুই তুই চার? হ্যালো, তুই তুই চার? কান্তিকুমার মিত্রকে আমি চাই। কান্তিই কথা বলছো? ওঃ, কান্তি! আমি থরহরি। কাশীপুরে একটা খুন হয়েছে—এক বাগানবাড়ীতে। কৃত্তিবাস সেনের বাড়ী। কৃত্তিবাস নিজেই নিহত। তুমি সেখানে চলে যাও—চট করে এক্ষুনি। এই খুনের রহস্য তোমাকে উন্মোচন করতে হবে। যত টাকা লাগে ব্যয়ের কোনো কার্পণ্য কোরো না। বিশ্ববার্তা তোমার পেছনে রয়েছে! গাড়ী ভাড়া আছে তো তোমার কাছে? বেশ। বেরিয়ে পড়ো তাহলে।"

রিসিভারের চোঙ্‌ যথাস্থানে রেখে তার পরমুহূর্তে বড়কর্তা ঘূর্ণী চেয়ারের আরেক ধারে ঝুঁকে পড়লেন (এই চল্লিশ ডিগ্রী আন্দাজ) —ঝুঁকে পড়ে তারযোগে আরাকানের যেসব বার্তা এসেছিল—নিজস্ব এবং পরস্মৈপদী সংবাদদাতাদের প্রেরিত সেই সব সংবাদে মনোযোগ দিলেন। কৃত্তিবাসকে তিনি আর চিন্তায় স্থান দিলেন না।

তাঁর কাজ করার ধরণই এই। বোধ হয় সব বিরাট ব্যক্তিরই ধরণধারণ এই রকম।

দুই

॥ খুনের কিনারায় ॥

খুনের কিনারা করা তো ঢের পরের কথা, কিন্তু মৎলব তাই হলেও আগে তার কিনারায় গিয়ে পৌঁছনো দরকার। লাশের কাছে এবং আশে পাশে অপরাধীর নানান্ নিশানা সাধারণ দৃষ্টির অগোচরে ছড়ানো থাকে—সন্ধানী নজরের অপেক্ষায়। কান্তি কুমারের গোয়েন্দা-সুলভ সেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি ছিল। কান্তি গোয়েন্দা নয়, কিন্তু অনেক গোয়েন্দার কান কাটে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কান্তিকুমারকে একটা মোটরে উপবিষ্ট হয়ে উর্দ্ধশ্বাসে কাশীপুরের দিকে ছুটতে দেখা গেল। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড় পেরুতে না পেরুতেই তার কানে এল, হকাররা হাঁকছে: "কাউন্সিলার খুন! বিশ্ববার্তা টেলিগ্রাম পড়ুন বাবু! আরেকজন কাউন্সিলার খুন!"

গাড়ী থামিয়ে দুটো পয়সা ফেলে দিয়ে এক পাতার একখানা টেলিগ্রাম কান্তিকুমার কিনেছে। গাড়ীতে বসেই দুর্ঘটনাটার ওপরে চোখ বুলিয়ে নিয়েছে একবার।

কৃত্তিবাস সেন নামজাদা একজন কাউন্সিলার। তাঁর গঙ্গা-তীরবর্তী বাগান বাড়ীতে কে বা কাহারা তাঁকে খুন করে রেখে গেছে। যে সব লক্ষণ দেখা যায় তাতে খুন বলেই সন্দেহ হয়—এমন কি, লক্ষণগুলির প্রত্যেকটি আলাদা আলাদা করে খুঁটিয়ে দেখলেও খুন ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কর্পোরেশনের এই হতভাগ্য কাউন্সিলার মৃত্যুকালে বেশভূষায় সুসজ্জিত ছিলেন—দেখলে বেশ ধারণা হয় মৃত্যুর জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। একটু আগে যে তিনি বিলিয়ার্ড্ খেলেছেন এরূপ ধারণা করাও খুব কঠিন নয়। বিলিয়ার্ড্ ঘরে চিৎপাৎ অবস্থায় তাঁকে পাওয়া গেছে—তাঁর একটা পা বিলিয়ার্ড্ টেবিলের এক পায়ায় ঠেকানো। একটা চটকদার

কাপড়ের টুকরো যদ্দূর মনে হয় তাঁরই নিজের রুমাল, তাঁর গলায় পাক দিয়ে জড়ানো—সেই রুমালের সঙ্গে আটকানো আবার বিলিয়ার্ডের কিউ। তাঁর সারা মুখে প্রশান্ত হাসি। অদ্ভুত এক প্রসন্নতা। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় শ্বাসরুদ্ধ হয়েই তাঁর অবসান ঘটেছে। তাঁর দেহে দুটি গুলির গর্তও দেখা যায়, প্রত্যেক দিকে একটি করে পিস্তলের গুলি বেরিয়ে গেছে মনে হয়। তার ওপরে আবার পিঠের শিরদাঁড়া ভাঙা। তাঁর হাত দুটি স্বামী বিবেকানন্দের ষ্টাইলে বুকের ওপরে বিন্যস্ত! এক হাতের মুঠোয় এখন পর্যন্ত বিলিয়ার্ডের বল ধরা। ঘরের মধ্যে ধ্বস্তাধ্বস্তি মারামারির কোন চিহ্ন নেই—যাবতীয় আসবাব পত্র যে যার যথাস্থানে —কোথাও এতটুকু বিশৃঙ্খলা ঘটেনি। কেবল পরিধেয় বস্ত্র থেকে চৌকো একটা ফালি অন্তর্হিত হয়েছে।

বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে এই খুনের নানাদিক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। পত্রিকা বলছেন, এই খুন নিয়ে সপ্তাহের মধ্যে তিনটি কাউন্সিলার মারা পড়লো। এই ভাবে কাউন্সিলার মারা পড়লে, এই জাতি, মানে এই কাউন্সিলার জাতি আর কতো-দিন টেকসই হবে? অকারণ কোনোরূপ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা তাঁদের অভিপ্রায় নয়, কিন্তু তা না হলেও, তাঁদের মতে এই কাউন্সিলার হানির আশু অবসান ঘটা উচিত। প্রত্যেক জিনিষেরই একটা সীমা আছে, যুক্তিসঙ্গত সীমা। এমন কি কাউন্সিলার-মড়কেরও। খামাখা কেন একজন কাউন্সিলার খুন হবে।

অবশ্যি, প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে কাউন্সিলারদের বেঁচে থাকারই বা কি দরকার? তাদের বেঁচে থেকে—বাঁচিয়ে রেখেই বা কি লাভ? কিন্তু এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। তারা বেঁচে থাকে। বেঁচে বর্তে থাকতে দেখা যায় তাদের—অত্যন্ত স্বভাবতঃই! এমন কি, সব দিক বিবেচনা করে দেখলে দেখা যাবে, জনসাধারণের কাছে, সমাজের কাছে, কাউন্সিলারের দাবী এমন কিছু বেশ নয়। এমন

কিছু বেশি তারা চায় না যেজন্য তাদের এ ভাবে অপসারণ করা আবশ্যক। কী চায় তারা? মাঝে মাঝে একটু তোয়াজ, কখনো ঘুষ, এবং সময়ে অসময়ে ভোট। ব্যস্, এর বেশি কিছু নয়। এর জন্যই কি তাকে ধরে ধরে খুন করতে হবে। এইভাবের কাউন্সিলার ক্ষতির তুলনায় ওজনে কিছু ভারী। সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে।

ইত্যাকার চুলচেরা খতিয়ে বিশেষ সংস্করণ বিশ্ববার্তার সম্পাদক এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে এই ধারায় কাউন্সিলারের বিয়োগ চল্‌তে থাকলে, আর এক জেনারেশনের (কিম্বা ডিজেনারেশনের) মধ্যে আর একজন কাউন্সিলারেরও আর অস্তিত্ব থাকবে না। মিসিং লিঙ্কের মত এরাও লোপ পাবে। এই জীবদের বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কি আমাদের সকলেরই সমবেতভাবে তৎপর হওরা উচিত নয়—এই প্রশ্নে তাঁর সম্পাদকীয় বক্তব্যের তিনি উপসংহার করেছেন।

কান্তিকুমার মিত্র গোয়েন্দা নন, বলেছি আগেই। কান্তিকুমার রিপোর্টার। বিশ্ববার্তার স্বকীয় বিশেষ সংবাদদাতাদের মধ্যে তিনি বিশেষত্ব। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠদ্দশা সাঙ্গ করে' বিশ্ববার্তার কার্যালয়ে তিনি চাকরি নিয়েছেন—এই দু'মাস। কিন্তু দু'মাসের মধ্যেই তিনি উন্নতির চূড়া থেকে চূড়ান্তরে উঠেছেন। কাজ নেওয়ার প্রথম সপ্তাহেই তিনি এক গুরুতর সমস্যাভেদ করেন: পাটের বাজার থেকে পাট লোপাট হওয়ার সমস্যা। দ্বিতীয় সপ্তাহে আমাদের নিত্য-প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য ভ্যাজালের কেলেঙ্কারী তিনি প্রকাশ করে' দেন। তৃতীয় সপ্তাহে এই শহরের কতিপয় গণ্যমান্য নাগরিকের কুকীর্তি লোকচক্ষে তিনি অনাবৃত করেন। তারপর থেকে, জটিল কুটিল যেখানে যা কিছু সমস্যামূলক হয়ে রহস্যভেদের অপেক্ষায় আছে সে সমস্তর ভার বিশ্ববার্তার দপ্তর থেকে তাঁর ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। অতএব এই খুনের কিনারা করার

হেতু বিশ্ববার্তার বড় কর্তা থরহরিবাবু যে কান্তিকুমারের স্কন্ধে নির্ভর করবেন তাতে আর আশ্চর্য কি ?

কান্তিকুমার অচিরেই খুনের কিনারায় এসে পৌঁছলেন। গঙ্গার ওপরেই প্রকাণ্ড ইমারত—বড় রাস্তার ওপরেই। এ ধারে রাস্তা—ওধারে গঙ্গা। কান্তিকুমার দেখল, পুলিশ চারধার ঘেরাও করে ফেলেছে। সেই ঘেরাওয়ের এখানে ওখানে ইতস্ততঃ অলস কৌতূহলীর দল জোড়ে বিজোড়ে দু পাঁচ সাত জনে জড়ো হয়ে গুলতানি পাকাচ্ছে। চারধারেই পাহারোলা। তাদের মুখের চেহারায় যেন এই প্রশ্ন দেগে দেয়া—অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি ? কিরূপ যেন একটা হতভম্ব মুখভাব—যা কেবল পুলিসের মুখেই দেখা যায়। সাধারণ পাহারোলার মধ্যে পুলিস কর্মচারীরও অভাব ছিল না। তাদের একজন বলছিলেন, "এই ব্যাপারের পেছনে নিশ্চয়ই একটা গভীর ষড়যন্ত্র আছে, কিন্তু তা যে কী, আমি আন্দাজ করতে পারছিনে।" অপর ব্যক্তির জবাব শোনা গেল, "আমিও ভাই তথৈবচ।"

তিন

॥ পুলিসের আক্কেল গুড়ুম ॥

থানার বড় দারোগা, তাঁর চেহারাখানাও বেশ বড়। লম্বা-চৌড়া রাজ-সংস্করণের চেহারায়—চোখে মুখে কোটাল-সুলভ কৌটিল্য। সাধারণতঃ বড় দারোগাদের মধ্যে যেমনটি দেখা যায়। এই লোকটিই কি সেই লোক যাঁর ঘোষণা আমরা যেখানে সেখানে যখন তখন দেখেছি—সহর আর সহরতলীর আনাচে কানাচে যাঁর সজাগ দৃষ্টি সর্বদা পাহারা দিচ্ছে ? যে-সতর্ক দৃষ্টি ঠগী আর বদ্‌মাইসদের হাত থেকে আমাদের বাঁচাতে

দ্বিধা বোধ করছে না—আমরা মারা যাবার পরে? না, বোধ হয় তিনি নন।

বাড়ীর সামনের একটা সরকারী ল্যাম্প পোষ্টে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন দারোগা। কান্তিকুমারকে দেখে তিনি গম্ভীর ভাবে ঘাড় নাড়লেন।

"কী? আক্কেল গুড়ুম নাকি আত্মনাথ?" কান্তিকুমার জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, কান্তি। আবার আমার আক্কেল গুড়ুম।" জবাব দিলেন বড় দারোগা ওরফে আত্মনাথ। তাঁর কণ্ঠস্বর সজল বলে' বোধ হোলো। "আমার ধারণা ছিল এটার আমি কিনারা করতে পারবো' কিন্তু এবারও আমি কোন কূল পাচ্ছি না।"

আত্মনাথ রুমাল দিয়ে, কপালের ঘাম মুছবার ছলনায় চোখের কোণ দুটো মুছে নিল।

"এই নাও সিগ্রেট্।" বলল কান্তি: "এখন বলোতো ব্যাপার-খানা কি? শুনি আগাগোড়া। রহস্যটা কোথায় দুর্ভেদ্য হয়েছে দেখা যাক।"

সিগ্রেট পেয়ে আত্মনাথ বাবুর চেহারা আরো উজ্জ্বল বোধ হোলো। চোর-ছ্যাঁচোড়েরা যেমন ঘুসি পেলেও খুসি হয়, পুলিসের লোকেরা তেমনি কোন না কোন প্রকারে ঘুষ না পেলে তুষ্ট নন্; এদিক দিয়ে তাঁরা দেবতাদের প্রায় সগোত্র, এইরূপ শোনা যায়।

সিগ্রেট উপহার লাভে আত্মনাথের উৎসাহ দেখা দিল।

"বল্ছি সব।" বল্লেন তিনি: দাঁড়াও, বাজে লোকগুলোকে আগে বিদেয় করে আসি।"

এই বলে, একজন পাহারোলার কাছ থেকে মোটা একটা লাঠি না কেড়ে নিয়ে কৌতূহলী জনতাকে তিনি তাড়া করলেন। দুইয়ে দুইয়ে, তিনে তিনে, চারে পাঁচে, জোড়ে বিজোড়ে ইতস্তত: যে সব ছোট খাট জনতা জমেছিল, সেই তাড়নায় বাত্যাতাড়িত জঞ্জালের

মত ইতোমষ্ট হয়ে স্ততোভ্রষ্ট হয়ে পড়ল। এখান থেকে সরে ওখানে গিয়ে জমল। সেখান থেকে নড়ল না। নড়বে কেন? কথায় বলে খুন খারাপী। খুনের সাথে সাথে খারাপীরা লেগেই থাকে।

"ওসব খারাপ লোকদের ছেড়ে দাও।" বলল কান্তিকুমার: "এখন কাজের কথা বলো। পদচিহ্নের খবর কি?"

কান্তি সটান কাজের কথায় পড়তে চায়। "পায়ের দাগ পাওয়া যায় নি? না কি—সেদিকে এখনো দৃষ্টি দেওয়ার ফুরসৎ হয়নি তোমার?

"দিয়েছি।" জানালেন আত্মনাথ: "সব প্রথমেই পায়ের দাগে আমার লক্ষ্য ছিল। সারা বাগানটাই পায়ের দাগে ভর্তি। এই যেমন ছাখো না—এই এক ধরণের পদচিহ্ন। একদম কাঠের পা।"

চাঁছাছোলা ঘাসালো জমির উপরে বিন্যস্ত এক জাতীয় বিশেষ দাগের প্রতি কান্তিকুমারের দৃষ্টি তিনি আকর্ষণ করলেন।

"এই দাগগুলো ছাখো। সহজে কি আমি দাগা পেয়েছি! এমনি কি আমার আক্কেল গুড়ুম হয়েছে?"

কান্তিকুমার দেখল।

"এই লোকটার একটা পা বেমালুম কাঠ। এই কাঠের পায়াওলা লোকটা—" বলতে লাগলেন আত্মনাথ: "যদ্দুর মনে হয় কোনো জাহাজের খালাসী। দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা বলেই মনে হয়—এডেন থেকে এখন আসছে। অল্পদিন হোলো করাচীতে নেমেছে। করাচী থেকে ট্রেনে এসেছে কলকাতায়। পায়ের দাগ দেখলেই এসমস্তই স্পষ্ট বোঝা যায়।"

কান্তিকুমার ঘাড় নাড়ল: "ঠিক।"

"আরো বোঝা যায়," বোঝাতে লাগলেন আত্মনাথ: "যে, এই লোকটার ডানহাতে একটা ছড়ি ছিল আর কোমরের ঘুনসিতে বাঁধা ছিল ছোট্ট একটা হুইসিল।"

"তা বেশ দেখতে পাচ্ছি।" কান্তিকুমার ভাবিত মুখে বলল,

"এই হুইসিলটা ছিল আমার ডানদিকে বাঁধা। এই কারণে ডানদিকে লোকটার একটু ঝুঁকি পড়েছে তাও দেখা যাচ্ছে।" বোঝাটাকে কান্তি আরো ভারী করে দেয়।

"তোমার কি মনে হয়, কান্তি, যে এই কেঠো পা খালাসীটাই এডেন থেকে এসে এই খুন্ করেছে?" আত্মনাথ সাগ্রহে জিজ্ঞেস করলেন: "সেই কি করতে পারে তোমার ধারণা?"

"খুব পারে।" কান্তি বলে: "এই সব খালাসীরাই তো এই সব কাণ্ড করে থাকে। খুন করতে পেলে আর কিছু তারা চায় না। জাহাজ থেকে নেমেই তারা খুন করে। লাস আর খালাসীর মধ্যে কেমন একটা জড়াজড়ি ভাব রয়েছে দেখছ না?"

বড় দারোগা ঘাড় নাড়লেন: "এবার এই দাগগুলো ছাখো, মনে হয় যেন কোনো কাবলিওলার। সুদের তাগাদায় যাতায়াত করা পা—দেখলেই বোঝা যায়। খাতকের অপেক্ষায় ওৎপেতে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা একনিষ্ঠ পা। এখানে সেখানে নড়ে চড়ে দাঁড়ালেও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা ধরে গেছে—এই পায়ের দাগগুলি দেখলে তাই কি মনে হয় না? ছাখো না, কি রকম মাটির মধ্যে বসে গেছে গভীর হয়ে—"

"হ্যাঁ।" কান্তি মাথা চালে: "এ লোকটাও খুন করতে পারে বটে।"

"এই রকম আরো কতো পায়ের দাগ।" আত্মনাথ বিবৃতি ছান:

"আরো কতো রকমের—কিন্তু সে সব কোনো কাজের নয়। বেশির ভাগ ওই সব অকর্মাদের।" এই বলে কৌতূহলী জনতার দিকে আত্মনাথ ভ্রূভঙ্গী করেন: "বাগানবাড়ীটা আমরা এসে ঘেরাও করে ফেলার আগে ওরাই তো জায়গাটা চষ্‌ছিল কিনা।"

"একটু থামো।" কান্তিকুমার কী যেন ভেবে নেওয়ার চেষ্টা করে। "আঙুলের ছাপ পাওয়া যায় নি?"

"আঙুলের ছাপ?" আত্মনাথ হতাশভাবে ঘাড় নাড়েন:

"আঙ্‌লের ছাপের কথা আর বোলো না। সারা বাড়ীটাই আঙ্‌লের ছাপে ভর্তি।"

"তার মধ্যে বর্মীর আঙুলের দাগ হতে পারে এমন কিছু পেয়েছো?" কান্তিকুমার উদ্‌গ্রীব হয়ে প্রশ্ন করে।

'বর্মীয় আঙ্‌লের দাগ তিন রকমের পেয়েছি।" আদ্যনাথের মুখ আরো গম্ভীর হয়ঃ "কিন্তু সে সব কোনো কাজের নয়।"

কান্তি আবার বিচক্ষণের মত মাথা দোলায়।

"কিন্তু দারোগা সাহেব," কান্তি নতুন সমস্যা নিয়ে আসেঃ "রহস্যময়ী নারীদের কি খবর? তাদের কাউকে দেখতে পাওনি এখানে এসে?"

"রহস্যময়ী নারী? দেখেছি। সকাল থেকে চারজন গেছে এ পর্যন্ত।" আদ্যনাথ বাৎলানঃ "একজন গেছে সকাল সাড়ে সাতটায়। একজন সোয়া নটায়। আর দুজন গেছে বারোটা বাজিয়ে—এক সঙ্গে—কাঁটায় কাঁটায় ঠিক বারোটায়। আদ্যনাথ বিষণ্ণ সুরে অনুযোগ করেনঃ "আমার মতে তারা প্রত্যেকেই রহস্যময়। সব মেয়েই আমার কাছে রহস্যময়ী বলে' মনে হয়।"

"আচ্ছা, এইবার অন্যদিক থেকে আরম্ভ করা যাক"—কান্তি বলেঃ "সমস্ত জিনিষটা নতুন করে' গড়বার চেষ্টা করা যাক—নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর দিক থেকে! যুক্তির পর যুক্তি সাজিয়ে রহস্যের পার পেতে হবে—এই খুনের কিনারায় পৌঁছতে হবে। ভালো কথা, কৃত্তিবাস সেন কি আইবুড়ো ছিলেন—তাই না?"

"আইবুড়োই বটে। বে থা করেননি, এবং এখন বুড়ো হতে চলেছিলেন। এতবড় বাগানবাড়ীতে একলাই থাকতেন তিনি।" আদ্যনাথ জানান।

"ভালো কথা। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর এক পেয়ারের খানসামা ছিল। তা না থাকলে তাঁকে দেখতে শুনত কে? এবং সেই

প্রিয় ভৃত্যটি নিশ্চয় তাঁর অতিশয় বিশ্বাসী আর পুরাতন—প্রায় বিশ বছর ধরে কাজ করছিল তাঁর কাছে?"

আত্মনাথ সায় দিলেন মাথা নেড়ে।

"তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বোধ হয়?" কান্তি জিজ্ঞেস করল।

"সবার আগে। চাকরকে আমরা কখনো ছাড়ি না—ছেড়ে কথা বলি না। বিশ্বাসী পুরানো চাকর হলে তো কথাই নেই। এবং তারাও ঠিক তাই প্রত্যাশা করে। বলব কি কান্তি, এই চাকরটা—নাম তার উদ্ধব—আমরা আসা মাত্রই আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করল! পালাতে পারত, কিন্তু পালায়নি। গ্রেপ্তার হবার জন্যেই অপেক্ষা করছিল হয়ত।"

"ঠিকই হয়েছে।" কান্তি বলল: "তারপর দেখা যাক্। ঐ চাকর ছাড়া আর কে কে ছিল বাড়ীতে? কোনো ঠাকুমা-দিদিমা স্থানীয়া? কোনো বুড়ি ঝি, দাই মা গোছের—যে শিশু অবস্থা থেকে কৃত্তিবাসকে মানুষ করে' তুলেছে। একেবারে বদ্ধ কালা এ রকম কোনো মেয়েছেলে পাওয়া যায়নি বাড়ীতে?"

"একেবারে হুবহু।"

"তার মানে?"

"ঠিক ওই রকমের এক বুড়ি ঝি—দাই মা গোছের…যে কৃত্তিবাসের শৈশব থেকে—"

"বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা সেই মেয়েটি কি এতবড় এই হত্যাকাণ্ডের সময়ে কোনো কিছু শুনতে পায়নি? কোনো অস্বাভাবিক আওয়াজ? ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ—বা—?"

"টুঁ শব্দটিও না। তবে খুব সম্ভব, এটা তার বদ্ধ কালামির জন্যই বোধ হয়।"

চার

॥ 'ঐ মেয়েটিকে আমি বাঁচাবো' ॥

"হ্যাঁ, তাও হতে পারে।" কান্তি ঘাড় নাড়লে। "আচ্ছা, ও ছাড়াও এই বাড়ীর পেছনে নিশ্চয় আস্তাবল আছে, সেখানে সহিস আর কোচম্যান বাস করে—ঘোড়াদের সঙ্গে। পেট্রল দুর্লভ হয়ে অনেকেই মোটরের পাট তুলে দিয়ে আজকাল ঘোড়ার গাড়ীর চর্চ্চা করছেন—কৃত্তিবাস সেন নিশ্চয় তার অন্যথা ছিলেন না? তা, সেই সহিস কোচম্যানরা কোথায়?"

"কোচম্যান এই খুনের রাত্রে সহিসকে নিয়ে কোন এক সিনেমায় হোলনাইট শো দেখতে গেছল—বাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে। ফিরেছে আজ সকালে। আমরা এখানে আসার পরে। কান্তি, ওদিকে সন্দেহ করবার কিছুই নেই—ওসব আমরা খুঁটিয়ে দেখেছি।"

"ওরা কজন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি কি ব্যক্তিণী কি ছিল না যে এই বাড়ীর সঙ্গে বা ই কৃত্তিবাসের সঙ্গে কোনো না কোনো প্রকারে বিজড়িত?"

"হ্যাঁ, ছিল। ছিল কেন, আছে। কৃত্তিবাস সেনের লেডি টাইপিস্ট অলকা দত্ত। কিন্তু সে আসে সকালের দিকে—কর্পোরেশন এবং কৃত্তিবাসের আপিস সংক্রান্ত কাজকর্মের ব্যাপারে, রাত্রির কাণ্ড কিছুই সে জানে না!"

"তুমি কি এই মেয়েটিকে দেখেছো?" কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন: "মেয়েটি দেখতে কেমন?"

"দেখেছি—দেখবার মত।" জানালেন আদ্যনাথ: "দেখতে মন্দ নয়, সুশ্রীই।"

"এবার এই মেয়েটির পালা। এবার এ বিপদে পড়বে, চাই কি মারা পড়াও বিচিত্র নয়। একে ঘিরেই হত্যাকারীরা চক্রান্ত করবে

এবার—স্পষ্ট আমি দেখতে পাচ্ছি।” দেখতে দেখতে কান্তিকুমার ভাবিত হয়ে পড়ে।

“কি করে বুঝলে?” আদ্যনাথও বিস্মিত হন। “খুন হবার মত কোনো কারণ মেয়েটির কোথাও নেই।”

“সেইজন্যেই তো খুন হবে। কৃত্তিবাসের মধ্যে তেমন কোনো কারণ ছিল না কি? সত্যি বলতে, এই কৃত্তিবাসই কিছু রামায়ণ লেখেনি—রামায়ণের জন্যে দায়ী নয়। তবু এ খুন হোলো। কেন হোলো? এ মেয়েটিরও তেমনি কোন দায় না থাকলেও হত্যাকারীরা একে আদায় করতে পারে। কেন ছাড়বে কেন?”

আদ্যনাথ কিছুই বলতে পারেন না। কেবল দাড়ি চুল্‌কান।

“কিন্তু যতই তারা চেষ্টা করুক, তারা ব্যর্থ হবে। বিপর্যস্ত হবে। হবেই। আমিই তাদের বিপর্যস্ত করবো। তাদের কুকর্মে বাধা দেব, তাদের চক্রান্তজাল ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলব। এই মেয়েটিকে আমি বাঁচাব।”

পাঁচ

।। রহস্য আরো নিবিড় ।।

কান্তি এবার দারোগাকে বলল: “আমাকে বাড়ীর মধ্যে নিয়ে চলুন।”

আদ্যনাথ আগে আগে চলল। অত বড় আর অমন সুসজ্জিত বাড়ীর ভেতরে কি অক্ষুণ্ণ শান্তি। কোথাও যেন কিচ্ছু ঘটেনি।

“গোলমালের কোনো চিহ্ন দেখছিনে কোনখানে।” বলল কান্তি।

“না।” জবাব দিলেন আদ্যনাথ বাবু: “কোথাও এক চুলের এদিক ওদিক ঘটেনি! তবে চুলচেরা ভাবে দেখলে তা বড় ঘটেও না। যে লোকটি খুন হয় কেবল সে ছাড়া আর সব কিছুই ঠিক

ঠিক থাকে। তার নিজের দেহ ছাড়া আর কোথাও কোনো বিপর্যয় বড় দেখা যায় না।”

ড্রইং রুমের দ্বার মুক্ত করে ভেতরে গেল তারা। ইলাহী ঘর, আশ্চর্য সব আসবাবে সাজানো। “চেয়ে দেখ, এখানেও অত বড় বিপর্যয়ের কোনো লক্ষণ নেই।” বলেন আত্মনাথ।

জানালায় জানালায় পর্দা নামানো, জামা-পরানো টেবিল-চেয়ার, চাদর-গায়ে-দেয়া পিয়ানো, ত্রিশঙ্কুর মত ঝোঝুল্যমান বিজলী বাতির ঝালর, সব যে যার যথাস্থানে যথাযথ রয়েছে। কোথাও কোনো ইতরবিশেষ ঘটে নি।

“এস ওপরে, বিলিয়ার্ডের ঘরে এস!” আত্মনাথ বললেন: “লাস অবশ্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে—ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য। কিন্তু আর সব কিছুই ঠিক সেইভাবে রাখা হয়েছে—এক চুল নড়ানো হয়নি।”

তারা দুজনে দোতলায় গেল। সিঁড়ি পেরিয়েই সামনে সেই বিলিয়ার্ড ঘর। প্রকাণ্ড বিলিয়ার্ড টেবল ঘরের মাঝখানটিতে, কিন্তু তার প্রতি দৃক্‌পাৎ না করে' সটান জানালার কাছে ছুটে গেল। “হা হা হা!” বলল সে: “এখানে কী? কী দেখছি এখানে?”

দারোগার মাথা নাড়ায় কোনো উত্তেজনা নেই। তাঁর কণ্ঠস্বর শান্ত। একটুও বিচলিত না হয়ে তিনি বললেন: “হ্যাঁ, জানালাটা দেখলে মনে হয় বটে যে বাহির থেকে খোলা হয়েছে। ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে খড়খড়িটা বার থেকে ফাঁক করা হয়েছে বলে বোধ হয়। জানালার বাহিরে কার্ণিশের জমাট ধুলোয় আন্দোলনের চিহ্নও দেখা যায়। মনে হয় অসাধারণ সাহসী কোনো লোক তলপেটের পর ভর দিয়ে খড়খড়ির ফাঁকে হাত গলিয়ে ধারালো কোনো অস্ত্রের সাহায্যে জানালার ছিটকিনিটা—কিন্তু ও নিয়ে ব্যস্ত হবার কিছু নেই কান্তিবাবু। বৃথা মাথা ঘামিয়ো না। সব খুনখারাপীর ব্যাপারেই ও হয়ে থাকে—প্রত্যেক কেসেই দেখা যায়।”

"সে কথা সত্যি।" কান্তি ঘাড় নেড়ে সায় দিল। এবার সে ঘরের ইতস্ততঃ তাকাতে লাগল। এবং তার কণ্ঠ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময়ের আবেগ উচ্চধ্বনি উছলে উঠল। "ওই কুলুঙ্গিটা দেখেছ? পর্দার প্রায় আড়ালে প্রকাণ্ড ওই তাকটা? তাকিয়ে ছাখো।"

"বহু আগেই দেখেছি।" আত্মনাথ জানালেন: "কুলুঙ্গির জমানো ধুলোর মধ্যেও চুশ্চিহ্ন দেখা গেছে। ধুলোর স্তর ইতস্ততঃ করা—বেশ নড়ানো চড়ানো। পায়ের দাগের ছাপও অস্পষ্ট দেখা যায়। অসাধারণ ক্ষিপ্র কোনো লোকের পক্ষে ঐ তাকের ওপরে লাফিয়ে উঠে পর্দার আড়ালে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা কিচ্ছু অসম্ভব নয়।"

"ছাদের কাছটা দেখেছো?" কান্তি এবার নজর উঁচু করে। "ছাদের কাছের ঐ ঘুলঘুলিটা?" একটু অস্বাভাবিক আকারের নয় কি? কি মনে হয় তোমার? ওখানে ও কি একজন—?"

"স্বচ্ছন্দে। কড়িকাঠে দড়ি লাগিয়ে দেয়ালের গা বেয়ে উঠে একজন লোক অনায়াসে ঐ ঘুলঘুলির ফাঁকে শুয়ে থাকতে পারে। অসাধারণ ধূর্ত কোনো লোক সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে বসবাসের জন্যে ঐ রকম জায়গাই বরং পছন্দ করবে!"

"এক মিনিট। থামো একটু।" কান্তির আবার নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে: "ঐ ভ্যানিটি ব্যাগের অর্থ কি? ওখানে ঝুলছে —ঐ যে?"

আধুনিক কোনো মহিলার অতি আধুনিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ-স্বরূপ চমৎকার একটি ভ্যানিটি ব্যাগ দেয়ালের গা-লাগা একটা আলনার আঁকশিতে ঝুলছিল।

"হ্যাঁ, ওটার কথাও যে ভাবা হয়নি তা নয়।" বললেন আত্মনাথ: "ওতে আমরা হাত দিইনি—ওটাকে ওখানেই রেখে দিয়েছি। কেমন যেন আমাদের মনে হয়েছে ওইখানেই ওই রহস্যের কিনারা আছে। বিশেষ একটা মতলবেই ওটা অমনি রেখে দেয়া হয়েছে।

যে ঐ ব্যাগটি নিতে আসবে, সে যে ঐ খুনের সঙ্গে কোনো না কোনো রূপে জড়িত তাতে আর কোনো ভুল নেই। আমাদের ধারণা—"

কিন্তু কান্তি আর উক্ত ধারণায় কর্ণপাত করছিল না। সে তখন বিলিয়ার্ড টেবিলের ধার ঘেঁসে গেছে।

"ছাখো ছাখো।" চিৎকার করে' উঠেছে সে: "এইবার বুঝি রহস্যের একটা কিনারা পাওয়া গেল। বিলিয়ার্ড বলগুলোর পজিশন ছাখো। সাদা বলটা টেবিলের ঠিক মধ্যে খানে আর লাল বলটা টেবিলের শেষ পকেটের একেবারে ধারে ধারে। এর মানে কি, আগুনাথ, মানে কি এর?"

আগুনাথ দারোগাকে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছে কান্তি— আগ্যোপান্ত ধরেছে। তার চোখে উদ্বেগ—কণ্ঠে ব্যাকুলতা ক্ষুরধার দৃষ্টি দিয়ে আগুনাথকে চুরমার করতে চায় যেন সে।

"আমার জানা নেই।" আগুনাথ জানালেন: "বিলিয়ার্ড খেলা আমি জানিনে।" এই আকস্মিক জড়াজড়িতে তাঁকে যেন একটু বিরক্তই দেখা গেল।

"আমিও জানিনে।" কান্তি বলল: 'কিন্তু আমাকে জানতে হবে এর রহস্য। এক্ষুণিই। এর উপরেই এই হত্যাকাণ্ডের আসল ফয়সলা নির্ভর করছে। কাছাকাছি বইয়ের দোকান নেই কোনো? কিম্বা কোনো লাইব্রেরী—ইংরেজী বইয়ের? একটা বিলিয়ার্ডের বই যোগাড় করা দরকার।"

এই বলে' আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে হাত পা নেড়ে কান্তি উধাও হয়ে গেল।

দারোগা আগুনাথ স্তব্ধ হয়ে—চিন্তাপ্লুত হয়ে—দাঁড়িয়ে রইলেন। হঠাৎ নিজেকে অত্যন্ত রোগা বলে তাঁর মনে হতে লাগল।

"চলে গেল!" অস্ফুট স্বগতোক্তি বেরুল তাঁর গলা থেকে— (তাঁর নিজের চিন্তাধারা ও মতামত নিজকে বিড়বিড় করে'

জানানোর এই বিড়ম্বনা তাঁর বহুকালের—তাঁর এই বদভ্যাস থেকে মনে হয় দেয়ালের কান থাকায় তাঁর বিশ্বাস নেই)।

"আশ্চর্য! থরহরিবাবু কেন ওর উপরে নজর রাখবার জন্য আমাকে টেলিফোনে জানালেন—? কান্তির গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখার জন্য প্রত্যহ তিনি পঞ্চাশ টাকা করে দেবেন তাও বলেছেন। কিন্তু কেন যে!—?"

ছয়

॥ 'ও বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়' ॥

ইতিমধ্যে বিশ্ববার্তা কার্যালয়ে থরহরি বাবুর বাড়ী যাবার সময় হয়েছে। কাজ সেরে তিনি হুক থেকে কোট পেড়ে নিয়ে নিজের গায়ে চাপাচ্ছেন। এমন সময়ে একজন কর্মচারী, বোধ হয় মনিবকে খুসি করার মৎলবেই অযাচিত ভাবে এগিয়ে এল।

"আজ্ঞে, আপনার কোটের হাতায় সবুজ মত কী দেখা যাচ্ছে। কিসের যেন দাগ। বিলিয়ার্ডের খড়ির দাগ বলেই বোধ হচ্ছে যেন। মুছে দেব কি?"

থরহরি ঘুরে দাঁড়ালেন। কর্মচারীটির আপাদ-মস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করলেন একবার। তারপর বললেন: এ বিলিয়ার্ডের খড়ি নয়। ফেস্ পাউডার। বুঝেছ?"

এই বলে, সেই বিরাট ব্যক্তিত্ব, এক কথায় বিলিয়ার্ডের চকের মত সেই লোকটিকেও যেন মুছে দিয়ে, শান্ত গম্ভীর পদক্ষেপে ধীরে ধীরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে নিজের মোটরে গিয়ে উঠলেন।

সাত

॥ করোনারের তদন্ত ॥

খুনের পরদিন করোনারের তদন্ত সুরু হোলো। কিন্তু তার ফলে পরিষ্কার হওয়া দূরে থাক, নতুন নানান জট পাকিয়ে পেকে উঠে রহস্য যেন আরো জটিল হয়ে উঠল। ডাক্তারী পরীক্ষার দ্বারা বিশেষ কিছুই জানা গেল না—নির্বিশেষে অনেক কিছু জানা গেল। উক্ত ডাক্তারের মতে মৃতের দেহে আঘাতের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কণ্ঠনালীর উপর চাপ পড়ায় নিঃশ্বাস বায়ুর পথরোধে মৃত্যু ঘটেছে এমন সিদ্ধান্তও করা যায়, আবার আলজিভ আটকে গিয়ে মৃত্যু ঘটাও কিছু অসম্ভব নয়। গলগ্রন্থির অত্যধিক স্ফীতি দেখা যায়। এদিকে মস্তিষ্কের স্নায়বিক শিরাও বিচ্ছিন্ন। এই সব নানাবিধ লক্ষণ বা দুর্লক্ষণের মধ্যে ঠিক কোনটি নিশ্চিত রূপে মৃত্যুর কারণ বলা কঠিন।

"তবে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার দেখা গেছে বটে। মৃতের পাকস্থলীতে আধসের টাক্ আফিম গোলা পাওয়া গেছে তরল পানীয়ের আকারে। এই সম্পর্কে করোনার কোর্টের সরকারী উকীল এবং উক্ত ডাক্তারের জিজ্ঞাসাবাদ বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

"পাকস্থলীর মধ্যে আফিম গোলা ঐ পরিমাণে পাওয়া কি একটু অস্বাভাবিক নয়?" তিনি প্রশ্ন করেছেন: "বিশেষ করে একজন কাউন্সিলারের পাকস্থলীতে? আপনার কি মত?"

'একটু অস্বাভাবিকই বই কি।' উত্তর হয়েছে ডাক্তারের "তবে সেটা সাধারণ পাকস্থলীর পক্ষেই প্রযোজ্য। একজন কাউন্সিলারের পেটে কিছুই অস্বাভাবিক নয়।

"আধসের আফিম গোলা একটু বেশী পরিমাণের বলে কি

আপনার মনে হয় না ?"

"তা ঠিক বলা যায় না।"

"তবে কি ওটা পরিমাণে কম আপনি বলতে চান ?"

"না, তাও বলতে চাই না ।"

"আধসের আফিম গোলা গলাধঃকরণের ফলে মৃত্যু কি একান্তই অনিবার্য ?"

"কোনো কাউন্সিলারের বেলায় তা নাও হতে পারে। হতেই যে হবে তার কোনো মানে নেই।"

"তবে কি—একজন কাউন্সিলারের পেটে আধমণ আফিম গোলা পেলেই আপনি আশ্চর্য হতেন ? এবং সেটা মৃত্যুর কারণ বলে মনে হোতো ?"

"মোটেই না। কাউন্সিলারদের হজমশক্তি সাধারণতঃই অসাধারণ।"

ডাক্তারী তদন্ত এইখানেই শেষ।

তারপরে কৃত্তিবাসের চাকর উদ্ধবের জবানবন্দী নেওয়া হয়েছে। তার কাছ থেকে অনেক রহস্য বার হয়েছে—কিন্তু তা রহস্যের উপর রহস্য। ম্যাগনোলিয়ার উপরে মালাই বরফ—পরস্পরে মিলে সমস্যাটা আরো জমজমাট হয়ে গেছে যোগফলে। উদ্ভব দিব্যি গেলে বলেছে দুর্ঘটনার দিনে সে নিজে হাতে আধ সের আফিম মিছরীর পানায় গুলে বিকেলের জলখাবারের সঙ্গে বাবুকে দিয়েছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও জানিয়েছে, এটা তার বাবুর নিত্যকর্মের মধ্যে—প্রত্যহের বৈকালিক জলযোগ। সরকারী উকিলের জেরায় সে বলেছে যে আফিমটা আধসের নয় আধ ভরি ছিল মাত্র, মিছরীর পানাটাই ছিল আধসের। তবে দুটোয় মিলে আধসের আধ ভরি ওজন হওয়া অসম্ভব নয় এটা সে সম্ভব মনে করে। এই ভৃত্যটি রবীন্দ্রনাথের পুরাতন ভৃত্যের মত সর্বগুণান্বিত না হলেও, বিশ বছর ধরে কৃত্তিবাসের তদ্বির তদারক করছে সেকথাও জানা গেল।

ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যানকেও পুঙ্খানুপুঙ্খ জেরা করা হোলো। প্রায় তিন বছর থেকে সে কৃত্তিবাস সেনের এখানে কাজ নিয়েছে—যুদ্ধের দরুণ পেট্রল দুর্ল্ভ হয়ে বাবুর মোটরগাড়ী অচল হওয়ার পর থেকেই সে আছে বলা যায়।

"এ কথা কি সত্য যে দুর্ঘটনার দিনে কর্তার সঙ্গে তোমার ভয়ঙ্কর কলহ হয়েছিল ?" করোনারের উকীল জিজ্ঞেস করেছেন।

হ্যাঁ সত্য, কর্তা সিনেমা দেখার ছুটি দিচ্ছিলেন না বলেই।"

"কর্তাকে তুমি খুন করবার ভয় দেখিয়েছিলে ? সত্য কি ?"

"না। সেকথা বলিনি।"

"কিন্তু লোকে যে শুনেছে তুমি খুন করব খুন করব বলে' চেঁচাচ্ছিলে ?"

"কথায় কথায় আমার মাথায় এমন খুন চেপে গেছল যে আমার কোন কাণ্ডজ্ঞান ছিল না। 'আমার মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে, হুজুর, আপনি আমার সামনে থেকে চলে যান।' এই কথাই আমি বলেছিলাম।" বলল কোচম্যান।

আট

॥ করোনারের কর নাড়া ॥

"তখন খুন চাপেনি, এখন খুনটা চাপছে—তাই নয় কি ?"

"না হুজুর।" বলেছে কোচম্যান।

করোনার তাঁর নথিপত্রের প্রতি তাকালেন। "অলকা দত্তকে ডাকা হোক।" তাঁর হুকুম হলো। অলকা দত্তের নামোচ্চারণের সাথে সাথে সারা আদালতে চাঞ্চল্যের সাড়া পড়ে গেল। অলকা ধীর পদক্ষেপে সাক্ষীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াল।

ছিপছিপে লতানো চেহারা অলকার। তার ফর্সা মুখে অদ্ভুত এক দীপ্তি। প্রত্যেক অকাণ্ড কুকাণ্ডের সঙ্গে—সমস্ত বিপর্যয়ের মূলেই কোনো না কোনো মেয়ে জড়ানো থাকে। আদালতের মধ্যে ডিটেক্‌টিভ বইয়ের পাঠক যারা ছিল তাদের কাছে তা অজানা ছিল না। এই চমৎকার মেয়েটি কি এই বিদঘুটে ব্যাপারের সঙ্গে কোনোরূপে জড়িত না কি? সেই সব পাঠকদের মনে এই প্রশ্নটাই বড্ড ধাক্কা মারছিল।

মেয়েটি কিন্তু সত্যিই কাঁপছিল। সে যে খুব বিপন্ন বোধ করছে তার মুখচোখ দেখলেই তা মালুম হয়। কিন্তু তাহলেও পরিষ্কার স্বরে, আস্তে আস্তে, মিষ্টি সুরে সে তার বক্তব্য বলে গেল। তার সাক্ষ্যের কোনোখানেও একটু হোঁচট খেল না।

প্রশ্ন হোলো, "কৃত্তিবাস সেনের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?"

অলকা। আমি তাঁর লেডি টাইপিসট ছিলাম।

প্রশ্ন। কতোদিন ধরে এ কাজ করছেন আপনি?

উত্তর। প্রায় বছর তিনেক।

প্রশ্ন। কখন আপনি কাজে যেতেন এবং ফিরতেনই বা কোন সময়ে?

উত্তর। আমি সকালের দিকেই যেতাম কেবল। বেলা দশটার মধ্যে আমার যা কাজ সব সেরে আমি বেরিয়ে পড়তাম।

প্রশ্ন। সেখান থেকে বেরিয়ে আপনি যেতেন কোথায়?

উত্তর। চৌরঙ্গীর এক রেস্তর াঁয় কিছু খেয়ে টেয়ে বাড়ী ফিরতাম তারপর।

প্রশ্ন। রোজই কি আপনি ঐ রেস্তর াঁয় দুপুরে খেয়ে থাকেন।

উত্তর। হ্যাঁ, রোজ। এখনও।

প্রশ্ন। রেস্তর াঁটার নামটা কি আমরা জানতে পারি?

করোনার সরকারী উকীলের এই প্রশ্ন বাতিল করে দিলেন—এ কথার উত্থাপন তিনি অনুমোদন করলেন না।

জুরিদের একজন জিজ্ঞেস করল, "শর্টহ্যাণ্ডও কি আপনার জানা আছে ?

"হ্যাঁ, পিটমানের।"

জুরিদের আরেক জনের, 'আপনি কি সিনেমায় যান টান' —এই প্রশ্নের জবাবে অলকা জানিয়েছে : হ্যাঁ মাঝে সাঝে, কেউ নিয়ে গেলেই।"

অলকার এই উত্তর আদালতের মনে খুব ভালো দাগ কেটেছে। তার সম্বন্ধে সজুড়ি করোনারের ধারণা একটু উচ্চতর হয়েছে যেন। এই একটি কথায় সেখানকার সর্বসাধারণের সহানুভূতি লাভ করল অলকা।

কিন্তু সরকারী উকীল তথাপি প্রশ্ন তুললেন : "কুমারী অলকা দত্ত, একটি কথা কি আমরা জানতে পারি ? খুনের পরে বিলিয়ার্ড-ঘরে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ঝুলতে দেখা গেছে সেটি কি—সেটি কি আপনার ?"

করোনার হাঁ হাঁ করে পড়লেন—"না না। এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই অনুমোদন করতে পারি না—" হাত নেড়ে তিনি বাধা দিলেন : "এ কথা কেন ? এসব অবান্তর কথা কেন ? এ প্রশ্ন থাক। মিস দত্ত, আপনাকে আর কোনো কথার জবাব দিতে হবে না। আপনি এখন কাঠগড়া থেকে নামতে পারেন।"

নয়

।। কালুকে কি কেউ দেখেছ ? ।।

কিন্তু সব চেয়ে বেশী সোরগোল পড়ল থরহরি বাবুর বেলায়। বিশ্ববার্তার পরিচালকথরহরি বাবু তাঁর সাক্ষ্যে জানালেন কৃত্তি-বাসের সঙ্গে খুনের দিন সন্ধ্যায় একত্র এক সাহেবী হোটেলে তিনি

খানা খেয়েছেন। এমন কি তাঁকে নিজের মোটরে করে কাশীপুরের বাড়ীতেও তিনি পৌঁছে দিয়ে এসেছেন।

"আপনি সেদিন সন্ধ্যা ঠিক কটার সময় কৃত্তিবাস বাবুর বাড়ীতে গেছলেন?" জিজ্ঞেস করলেন সরকারী উকিল: "এবং কতোক্ষণ ছিলেন তাঁর সঙ্গে?"

"এ প্রশ্নের জবাব আমি দেব না।" বললেন থরহরিবাবু। "কিছুতেই না।"

"কেন, এর দ্বারা কি আপনার এই ব্যাপারে জড়িত হয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা আছে?" জিজ্ঞেস করলেন করোনার থরহরি বাবুকে।

"তা হতে পারে।" বললেন থরহরি।

"তাহলে এর উত্তর দেয়া না দেয়া আপনার খুসি। আপনি স্বচ্ছন্দে নিরুত্তর থাকতে পারেন। আইনতঃ সে অধিকার আপনার আছে।"

থরহরিকে এই কথা বলে' করোনার সরকারী উকীলের দিকে ফিরলেন: "তাহলে ওঁকে আর ওই প্রশ্ন করবেন না। উনি ক্ষুব্ধ হচ্ছেন। অন্য কিছু জিজ্ঞেস করুন।"

"আচ্ছা বেশ।" সরকারী উকিল থরহরির দিকে আবার ফিরলেন: "তারপর ওঁকে বাড়ীতে পৌঁছে দেবার পরে আপনারা দুজনে অনেক রাত পর্যন্ত বিলিয়ার্ড খেলেছিলেন—এ কথা কি সত্যি?"

"থামুন থামুন!" করোনারের কাছ থেকে বাধা এল আবার: "করছেন কী! এ প্রশ্ন আমি কিছুতেই করতে দিতে পারি না। একেবারে সোজাসুজি—নিতান্ত খোলাখুলি এ কি অভদ্র প্রশ্ন! এই প্রশ্নের উদ্দেশ্য তেমন সাধু নয়—এর মধ্যে বিচ্ছিরি কোনো ব্যাপারের যেন ইঙ্গিত রয়েছে মনে হয়। আপনি অন্য কোনো প্রশ্ন করুন।"

"বেশ, তাই।" ঘাড় নাড়লেন সরকারী উকীল। "আচ্ছা বলুন তো থরহরি বাবু, নীল রঙের এই খামখানা এর আগে আপনি কখনো দেখেছেন কি না ?"

"আমার জীবনে না।" থরহরি জানালেন।

"অবশ্যই উনি দেখেন নি।" বললেন করোনার : "এ বিষয়ে দ্বিরুক্তি করার কি আছে? ওঁর মত মান্য ব্যক্তি কি অকারণে নিঃস্বার্থ ভাবে মিথ্যা বলবেন। দিন তো দেখি খামটা, কী আছে ওতে ?"

"আজ্ঞে, এই খামখানা নিহত কৃত্তিবাসের জামায় আল্‌পিন দিয়ে আঁটা ছিল, হুজুর।

"তাই নাকি ? বললেন করোনার : "কী আছে ঐ খামে ?"

আদালত-শুদ্ধ রুদ্ধশ্বাস স্তব্ধতার মধ্যে সরকারী উকীল নীল খামের ভেতর থেকে সবুজ রঙের একখানা কাগজ বার করলেন। সবুজ কাগজখানায় আবার ষ্ট্যাম্প লাগানো। সবুজ পত্রের লেখাটা তিনি পড়তে লাগলেন :

"আমি কাশীপুর কলিকাতা নিবাসী শ্রীকৃত্তিবাস সেন বহাল তবিয়তে এবং সম্পূর্ণ স্বেচ্ছায় আমার এই সর্ব শেষ উইল করিতেছি। এতদ্বারা আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ দখল স্বত্ব আমার ভ্রাতুস্পুত্র এবং একমাত্র উত্তারাধিকারী শ্রীমান কালু সেনকে দিয়া গেলাম।"

সারা আদালত এই উইল শুনে একবার যেন খাবি খেল। কারো মুখে একটি কথা নেই। কেবল করোনার চারিদিকে ঘুরে ফিরে তাকালেন একবার।

"কালু সেন কি এখানে উপস্থিত আছেন ?" হাঁক দিলেন করোনার।

কোনো উত্তর এল না।

"এখানকার কেউ কি এই কালু সেনকে দেখেছেন ?" আবার

করোনারের হাঁক শোনা গেল।

তবুও কোনো সাড়া শব্দ নেই।

আবার সেই একই প্রশ্ন তথাপি কাউকে নড়তে চড়তে দেখা গেল না।

"হুজুর, এই কালু সেনকে পাওয়া গেলেই এই মৃত্যুর রহস্যের হয়ত কোনো কিনারা হতে পারে।" শেষ কথা বললেন সরকারী উকীল। "হলেও হতে পারে।"

দশ মিনিট ধরে গবেষণা করে' জুরি এবং জজ একমত হয়ে তাঁদের রায় এটাকে খুন বলেই সাব্যস্ত করলেন। কে বা কাহারা অগোচরে এসে কাশীপুরের কৃত্তিবাস সেনকে খুন করে' গেছে এই কথা তাঁদের রায় থেকে জানা গেল। আরও জানা গেল যে, এই কাণ্ডকে কিছুতেই আত্মহত্যা বলে গণ্য করা যায় না। জনৈক জুরি তাঁর স্বতন্ত্র রায়ে জানালেন, এই খুন যে শ্রীমান কালুর কীর্তি, সে ছাড়া আর কারো না, সে বিষয়ে তিনি দশ টাকা বাজি ধরতেও রাজি আছেন।

করোনার উদ্ধব চাকরকে বেকসুর খালাস দিয়ে উক্ত কালুর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার করার হুকুম দিলেন।

দশ

॥ কান্তি কিন্তু ক্লান্তি জানে না ॥

হতভাগ্য কাউন্সিলারের ধ্বংসাবশেষ মর্গ থেকে উদ্ধার করে' স্বর্গের পথে রওনা করে' দেয়া হোলো। যতদূর সম্ভ্রম এবং সমারোহের সঙ্গে কাউন্সিলার-তুল্য একজনের সদ্গতি করা উচিত তার কোনোই ব্যত্যয় করা হোলো না। তাঁর শবযাত্রাকে শোভাযাত্রায় পরিণত করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছিল—তবু

কেবল কয়েকটা রাস্তার চ্যাঙ্‌ড়া ছাড়া নিমতলা ঘাট অবধি শেষ পর্যন্ত কেউ গড়াল না। প্রত্যেক রাস্তাতেই এই চ্যাঙ্‌ড়ারা স্বাভাবিক কৌতূহলবশে কিম্বা হরিবোল দেবার প্রলোভনে স্বর্গীয় কাউন্সিলারের পিছু নিয়েছিল, কিন্তু নিজেদের রাস্তার সীমানা পর্যন্ত এগিয়েই ফের পিছিয়ে এসেছে। যাই হোক, রিলে-রেসের মতন বদলে বদলে গেলেও, কোনো না কোনো রূপে এই চ্যাঙড়ারাই, কাউন্সিলারটির শূন্য স্থান পূর্ণ করার কোনো স্বার্থ বা সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই অপূরণীয় জাতীয় ক্ষতির মহিমা এবং মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করেছে দেখা গেল।

কলিকাতা-মহানগরী আবার তার সুস্থ অবস্থায় ফিরে এল। কৃত্তিবাস সেন এবং তার মৃত্যুরহস্য আস্তে আস্তে ভুলতে বসল সবাই।

ভুলল না কেবল কান্তি। আহার নেই নিদ্রা নেই টো টো করে' ঘুরছে। রোদ নেই বৃষ্টি নেই (এবং সেইজন্যেই মাথায় ছাতা নেই) ঘুরছে সে। এই এখানে, ওই সেখানে—সর্বত্র সে। কোথায় নেইকো? কালু সেনের সন্ধানেই ঘুরছে কান্তি। যেখানেই কয়েকজন জড়ো হয়ে গুলতানি করছে কান্তি হাজির, আর কিছু না, কালু সেনের খোঁজে। হাওড়া শেয়ালদার মত জায়গায়, হাজার হাজার লোক সর্বদাই যেখানে ওতোপ্রোতো হচ্ছে—অনুক্ষণ কত যাত্রীর যাতায়াত—কান্তি মিত্র সেখানে ক্লান্তিহীন। এই সে এধারে, আবার সে ওধারে—প্রত্যেকটি লোকের মুখের ওপর গভীর এবং তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত বুলিয়ে নিতে ব্যস্ত। একজন ষ্টেশনের কর্মচারী একবার তো ওর ঘাড়খানাই ধরল—"কী হচ্ছে? কী হচ্ছে এ সব? লোকের মুখের দিকে অমন করে' তাকাচ্ছ কেন?" কান্তি বললে: "একজন দাগী আসামীর আমি সন্ধানে আছি। আমি ডিটেক্‌টিভ।" "মাপ করবেন, আমি জানতাম না। কিছু মনে করবেন না," বলে কাঁপতে কাঁপতে সাত হাত

পিছিয়ে গেছে সেই কর্মচারী। গোয়েন্দা আর সাপ কাকে কখন ছোবল্ মারবে কেউ বলতে পারে? শত হস্তেন গোয়েন্দানাং— একজন গোয়েন্দাও আরেক জনের একশ হাত তফাতে থাকে।

সারাদিন ধরে এধারে ওধারে নানাধারে কান্তি ইতস্ততঃ করছে তার কামাই নেই। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে চায়ের দোকানে বসে' —একটার পর একটা দোকানে—এবং যত চা-পায়ী যাচ্ছে আসছে তাদের ওপর নজর দিতে তৎপর! এমন কি, তিনদিন সে ছুতোরের ছদ্মবেশ ধরে কি এক ছুতোয় থরহরি বাবুর বাড়ীর দ্বারদেশে ও কাটিয়েছে—যদি সেখান থেকে এই কালুর কোনো সন্ধান মেলে।

কিন্তু তথাপি এই কালুর কোনো হদিশ নেই। যতদূর জানা আছে উক্ত শ্রীমান্ তিন বছর আগে অবধি তার কাকা কৃত্তিবাসের আলয়ে থাকত—তারপর হঠাৎ সে একদিন কেন বলা যায় না, সেখান থেকে উধাও হোলো। এই পাত্তাড়ি গুটোবার পর থেকে আর তার কোনো পাত্তা নেই। সে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেল, বিশ্ববার্তার বিখ্যাত সম্পাদকীয় ভাষায় তখন এই মন্তব্য করা হয়। ধরণী দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে হাঁ করে' তাকে গিলে ফেলল নাকি? —এ প্রশ্নও তখন করা হয়েছিল।

এগার

॥ 'এই নাগ্‌রাওয়ালাকে এক্ষুণি পাকড়াও' ॥

তিন বছর আগে বিশ্ববার্তার সম্পাদকীয় স্তম্ভে যাই বলা হোক না কেন, কান্তি কিন্তু হার মানার পাত্র নয়। উক্ত হাঁ করা ধরণী কে হতে পারে তা নিয়ে সে অবশ্যি একটু মাথা ঘামিয়েছিল। যেই হোক কৃত্তিবাস সেনের কর্পোরেশনের প্রতিদ্বন্দ্বী ধরণী সেন

নয় এই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হবার এক সপ্তাহ বাদেই সে আত্মনাথের কাছে গিয়ে হাজির হোল।

"দারোগাবাবু," বলল গিয়ে কান্তি: "আমার আর কতকগুলি বিষয় জানার দরকার। আমাকে আর একবার কৃত্তিবাস সেনের কুটীরে নিয়ে চল তো।"

দুজনে আবার বরানগর কাশীপুরের সেই বিরাট অট্টালিকায় প্রবেশ করল। বিলিয়ার্ড ঘরে পা দেবার সময়ে কান্তি বলল: "প্রথমবারে হয়ত এখানকার কিছু কিছু আমাদের নজর এড়িয়ে গিয়ে থাকবে। আদৌ তা অসম্ভব নয়।"

"তাতো হয়ই। নজর এড়িয়ে যায়ই তো।" কান্তি কুমারের অভিযোগে আত্মনাথবাবু সায় দিয়েছেন।

"আচ্ছা এখন বলো তো," কান্তি আরম্ভ করে—(তারা তখন সেই বিলিয়ার্ড টেবিলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে)—"এই খুনের ব্যাপারে তোমার নিজের ধারণাটা কি? তোমার, মানে পুলিসের ধারণার কথাই আমি বলছি। ধরণাগুলি একে একে বাৎলাও তো—সবগুলিই আমার জানা দরকার।"

"আমাদের প্রথম ধারণা কী ছিল তাতো তোমার অজানা নয় কান্তি। এই হত্যাকাণ্ড এডেন্ থেকে সদ্য আগত কোনো এক পা ওয়ালা (আরেক পা কাঠের) দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীর দ্বারা ঘটেছে—এই ছিল আমাদের সর্ব প্রথম ধারণা।"

"বেশ উচ্চ ধারণা। এমন কিছু অসঙ্গত নয়।" সায় দিল কান্তি।

"আমাদের ধারণায় এই লোকটা হচ্ছে কোনো মালবাহী জাহাজের খালাসী।"—এক ঘেয়ে সুরে একটানা পূর্ব বৃত্তান্ত দিতে সুরু করল আত্মনাথ। "এই লোকটা অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যে ত্রিশ ফুট উঁচু এই বাড়ীর গা বেয়ে উঠে—একজন রাজ-মিস্ত্রিও সারা দিনে যার সাত ফুটের বেশি উঠতে পারে না—উঠে

এই বিলিয়ার্ড ঘরের জানালার বাইরে পৌঁছে অসাধারণ কৌশলের দ্বারা বাহির থেকে খড়খড়ির খিল খুলে ঘরের মধ্যে ঢুকেছিল। লোকটা যে অসাধারণ ধূর্ত তাও বেশ বোঝা গেছল নিহত কৃত্তিবাসের গলায় প্যাঁচানো রুমালের অদ্ভুত পাক দেখে। ও রকম কড়াপাক কেবল ভবানীপুরের সন্দেশের দোকানে আর এডেনের ধাড়ী ধাড়ী বদমাইসের রুমালেই দেখতে পাওয়া যায়, এবং এও জানা গেছল যে লোকটার একটা পা একদম কাঠের—"

বলতে বলতে আছনাথ দারোগা থামলেন। তাঁকে যেন একটু চিন্তাকুল দেখা গেল।

"একটা পা একদম কাঠের—এই রকমই আমাদের ধারণা হয়েছিল প্রথম। কিন্তু কেন যে এরূপ ধারণা হোলো তা এখন আমি বলতে পারব না। একদম আমার মনে পড়ছে না।"

"দূর দূর! কী যে বলো তুমি আছনাথ! এই ধারণা হবার কারণ এই যে বিলিয়ার্ড টেবলের এধারের মেহগনির ওপরে লোকটার হাতের চাপ পড়েছিল—এবং চাপটা বেশ একটু বেশি রকমই পড়েছিল—যেটা সাধারণ মানুষের চাপ হিসাবে ঠিক স্বাভাবিক নয়। তাই থেকেই বোঝা গেল যে লোকটার ওপরার্দ্ধের ভার নিম্নার্দ্ধের চেয়ে গুরুতর—তাই নয় কি? তাই থেকেই লোকটার কাঠের পা সম্বন্ধে ধারণা জন্মালো—পায়ের দিকটা তার মাথার দিকের চেয়ে হালকা বলেই না?—এই কাঠের ধারণা তার সম্বন্ধে এমন কিছু কঠোর ধারণা নয়। কিন্তু এই প্রথমকার ধারণা এখন আমরা বর্জন করেছি। তাই নয় কি?"

"নিশ্চয়ই। প্রথমকার ধারণা আমরা প্রথমেই বর্জন করে থাকি। আমাদের চিরকালের দস্তুর। আমাদের দ্বিতীয় ধারণা হচ্ছে—"

কিন্তু কান্তির কান আর সেদিকে ছিল না। মেজের ওপর কী যেন সে তীব্র নেত্রে নিরীক্ষণ করছিল।

"হাঃ হাঃ! একি দেখছি মেজেয়?—আনন্দ কি দুঃখ কিসের

আবেগে বলা যায় না। পুনঃ পুনঃ কান্তির অট্টহাসি শোনা গেল "এর অর্থ কী? হাঃ হাঃ হাঃ।"

মেজের একটি অমার্জিত জায়গায় আত্মনাথের দৃষ্টি সে আকর্ষণ করল।

"এ তো আমরা দেখিনি।" বললেন আত্মনাথ। "আগে তো দেখিনি।"

"পায়ের দাগ।...পায়ের নয়, জুতোর।" বলতে বলতে কান্তি পকেট থেকে ম্যাগনিফাইং গ্লাস বার করে পরীক্ষা করতে সুরু করল।

"এক জোড়া জুতোর ছাপ্—একটাও তার কাঠের নয়। নাগরা জুতো বলেই মনে হচ্ছে—লক্ষ্ণৌয়ী নাগ্রা। তবে আগ্রার হওয়াও আশ্চর্য না। জুতোর তলায় বড় বড় কাঁটি মারা—কিম্বা ঘোড়ার পায়ে যেমন নাল লাগানো হয় তাও হতে পারে, লোকটা পাঁচ ফুট—সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা—"

"একটু সবুর করো, কান্তি!" আত্মনাথ বাধা দিয়ে বললেন: "তুমি যে কী বলছ আমি ঠাওর করতে পারছি না। লোকটা যে ঠিক অতটাই লম্বা তা কি করে তুমি জানলে?"

"পায়ের পাতার পরিধি থেকে পা কতখানি উঁচু তা ধরতে পারছি। আর পায়ের দৈর্ঘ্য পেলে লোকটার আসল উচ্চতা টের পেতে আর অসুবিধা কি? আত্মনাথ, এই নাগরাওলা লোকটাকে এক্ষুণি পাকড়াও। ওকে পেলেই এই খুনের রহস্য ভেদ হবে।"

এবং ঠিক সেই মুহূর্তেই সিঁড়ি দিয়ে নাগরা জুতোর খটাখট শোনা গেল। বিলিয়ার্ড ঘরের দরজা খুলে সেই নাগরাওয়ালা প্রবেশ করল তারপর।

কান্তি এবং আত্মনাথ দুজনেই এক সঙ্গে চমকে উঠলেন। এমন কি, সেই ঘরে চোখের সামনে তখন নাগাপ্রপাত দেখলেও বোধ হয় ততখানি বিচলিত হতেন না।

লোকটা ঠিক পাঁচ ফুট সাড়ে ন ইঞ্চি লম্বা। পায়ে তার নাগ্রা (লক্ষ্ণৌ বা আগ্রা যেখানকারই হোক)। লোকটার পরণে কোচম্যানের পোষাক! আদব কায়দা কেতাদুরস্ত।

পরলোকগত কৃত্তিবাসের ঘোড়ার গাড়ীর কোচম্যান দেখবামাত্র বুঝতে কান্তি বা আদ্যনাথের কোনো বেগ পেতে হোলো না।

"আপনিই কি কান্তিবাবু?" জিজ্ঞেস করল সেই কোচম্যান; "একটি ভদ্র মহিলা আপনার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক।"

বার

॥ 'কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান আমায়।' ॥

পর মুহূর্তে সিঁড়িতে প্রায় নিঃশব্দ পদধ্বনি শোনা গেল। লম্বা এবং চমৎকার একটি তরুণী অতি আধুনিক বেশ ভূষায় সুসজ্জিত হয়ে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করলেন।

কুমারী অলকা দত্ত।

অলকার সাজ সজ্জায় আধুনিকতার অত্যন্ত উগ্রতা থাকলেও তার হাতে যে ভ্যানিটি ব্যাগ ছিল না তা কান্তির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়ায়নি।

"কান্তিবাবু," অলকা উচ্ছ্বসিত স্বরে বলল: "আপনিই কান্তিবাবু, তাই না? এরা বলছিল যে আপনি এখানে এসেছেন কান্তিবাবু, আপনি বাঁচান আমায়।"

অলকার দেহ থরথর কাঁপছিল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল তার।

"শান্ত হও কুমারী অলকা দত্ত।" সান্ত্বনার ছলে বলল কান্তি। বিচলিত হোয়ো না। এত ঘন ঘন তোমার নিশ্বাস খরচ কোরো

না। এমন হাঁস ফাঁস করবার কি আছে? আমাকে বিশ্বাস করো, আমি তোমাকে নির্ঘাত বাঁচাব।"

"আমারো তাই বিশ্বাস।" নিশ্বাসের দ্রুতগতি অনেকটা কমিয়ে এনে বলল অলকা।

"কী বলবার আছে আমায় বলো তুমি।" বলল কান্তি।

"কান্তিবাবু,—নিজেকে সামলাতে পারলেও তখনো অলকার গলা কাঁপছিল, "আমার ভ্যানিটি ব্যাগটা আমি চাই।"

"বোসো। দিচ্ছি এনে।" এই বলে, কান্তি আলনার আঁকশি থেকে ব্যাগটা পেড়ে এনে অলকার হাতে তুলে দিল।

"আঃ, এটা ফিরে পেয়ে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে। কী বলব!" ব্যাগটাকে আদর করে' নিজের গালে একবার বুলিয়ে নিল অলকা। "আপনাকে যে কি ভাষায় ধন্যবাদ জানাবো জানিনে। এটা নিতে আসতে আমার যা ভয় করছিল।"

"না না, ভয়ের কোনো কারণ নেই।" আদ্যনাথ বাবু জানালেন: "পুলিসের ধারণায় এই ব্যাগটা হচ্ছে এই বাড়ীর বুড়ি ঝির। আপনি স্বচ্ছন্দে এটা নিতে পারেন।"

কান্তি কিন্তু মেয়েটির দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল—"আমার মনে হয় এই খুনের ব্যাপারে অনেক কিছুই তুমি জানো! সত্যি সত্যি কি না? তাহলে আমাকে বলো সে সমস্ত।"

"বলব। আমি বলব কান্তিবাবু! ওঃ, কী ভয়ঙ্কর সেই রাত —ভাবলে এখনো আমার বুক কাঁপে। এখানেই ছিলাম আমি তখন। সব দেখেছিলাম—না দেখলেও—নিজের কানে শুনেছি সব।"

অলকা বারম্বার কেঁপে উঠল।

"ওঃ কান্তিবাবু, এমন ভয়ঙ্কর দৃশ্য আমি জীবনে দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যায় আমি এখানে এসেছিলাম। হাতের অনেক কাজ বাকী পড়েছিল, সেগুলো সারতে এসেছিলাম। কৃত্তিবাসবাবুর সেদিন

সন্ধ্যায় কোথায় যেন নেমন্তন্ন ছিল শুনেছিলাম, কাজেই নিরিবিলি অপিস ঘরে বসে আমার কাজ সারতে কোনো বাধা হবে না ভেবেছিলাম। যখন এলাম, কেউ ছিল না তখন। এই বিলিয়ার্ডঘর পেরিয়েই তো গেলাম—এখানের আলনায় আমার ভ্যানিটি ব্যাগ রেখে ওপাশের আপিস ঘরে গিয়ে নিজের কাজে মন দিয়েছি—কতক্ষণ একমনে কাজ করেছি তা মনে নেই—হঠাৎ এই বিলিয়ার্ড ঘরের থেকে চেঁচামেচি আমার কানে গেল। চেঁচামেচি ক্রমশঃ ঝগড়া হয়ে দাঁড়াল—দু'জনের দারুণ কলহ—শুনলাম। সমস্তই নিজের কানেই শুনতে হোলো। শোনা খুব অন্যায় হয়েছে কি, কান্তিবাবু?"

"কিছুমাত্র না।" বলল কান্তি: "চোখের পাতা বোজা যায়—অবাঞ্ছনীয় দৃশ্য আমরা ইচ্ছা করলে নাও দেখতে পারি। কিন্তু কানের পাতা বোজবার যে কোনো উপায়ই বিধাতা রাখেন নি, অলকা দেবী।"

"আপনার কথা শুনে আমার শরৎবাবুর উপন্যাসের কথা মনে পড়ছে, কিন্তু সে-কথা থাক, কান্তিবাবু। তারপর কী শুনলাম, শুনুন। একজন বলছিল, "য়্যায়, কি হচ্ছে? তুমি টেবিলের ওপর অতটা ঝুঁকি দিচ্ছ কেন?" আরেকজন বলল, "আমার খুসি।" তখন প্রথম জন বলল, "টেবিলের ওপর থেকে তোমার ভুঁড়ি সরিয়ে নাও। হটাও তোমার ভুঁড়ি।" দ্বিতীয় জন বলল—"হটাবো না। আমার ভুঁড়ি আমার—তোমার কি?" তখন সেই ১ নম্বর লোকটা বলল—ভয়ঙ্কর গর্জে উঠল এবার—"তোমার ভুঁড়ি তোমার? বটে? এক্ষুনি সরিয়ে নাও বলছি, নইলে এই পিস্তলের গুলিতে, দেখছ ত, ঐ ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেব।" তারপর একটুক্ষণ চুপচাপ। তার একটু বাদেই আর্তনাদ শুনতে পেলাম—"ফাঁসিয়েছ, ফাঁসিয়েছ! সত্যিই তুমি আমার ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দিলে?" তখন অপর ব্যক্তিটি, নরম গলায় একটু অনুতপ্ত সুরেই বলল যেন, "আমায় ক্ষমা করো।

আমি ফাঁসাবো বলে ফাঁসাই নি। আমার গুলি যে তোমার ঐ গণ্ডারের চামড়া ভেদ করতে পারবে এ বিশ্বাস আমার ছিল না।”

অলকা একটু দম নিল। কান্তি ও আদ্যনাথ বলল: “তারপর? তারপর কী হোলো?”

“তারপর আমার এমন ভয় হোলো আমি আর দাঁড়াতে পারলাম না। হুদ্দাড় করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে পালিয়ে একছুটে নিজের বাড়ীতে চলে এলাম—পরদিনের খবরের কাগজে সে রাত্রির সমস্ত ঘটনা জানা গেল। আমার ব্যাগটা বিলিয়ার্ড ঘরে পড়ে আছে তাও জানতে পারলাম। তারপর থেকে যে কী ভয়ে-ভয়ে —কান্তিবাবু, আপনি আমাকে বাঁচান।”

“অবশ্যিই বাঁচাবো, তুমি ভয় খেয়ো না, অলকা দেবী। নির্দোষকে কেবল মারা নয়, মাঝে মাঝে বাঁচানোও, আমাদের গোয়েন্দাদের ধর্ম বইকি। তুমি ঠাণ্ডা হও। এখন একটা কথা আমায় বলো দেখি। যে লোকটা কৃত্তিবাস সেনের বিপক্ষে খেলছিল —তাকে কি তুমি দেখেছিলে?”

“একবার মাত্র, চকিতের জন্যই।” বলতে একটু ইতস্ততঃ করল অলকা: “দরজা একটুখানি ফাঁক করে’—সেই ফাঁকে একটু ঈষৎ দেখেছিলাম।...খুব অন্যায় করেছি, মাপ করবেন।”

“কি রকম দেখতে লোকটা?” জিজ্ঞেস করল কান্তি: “মুখ দেখলে কি মনে হয় তার মনের মধ্যে প্রবেশ করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার? খুব দুর্ভেদ্য—অনেকটা এই রকম মুখ কি?” কান্তিমিত্র কায়ক্লেশে নিজের মুখে অলকার সম্মুখে দৃষ্টান্তটা দেখাবার চেষ্টা করে।

“অবিকল।”

“প্রকাণ্ড লম্বা চৌড়া একটা মুখ—মনে হয় সমস্ত দেহে কেবল শুধু ঐ মুখখানাই আছে?”

“তাই মনে হয় বটে।”

"অলকা দেবী," কান্তি জানাল: এই খুনের রহস্য আমি প্রায় ভেদ করে এনেছি। যখন বাকিটুকুরও কিনারা করতে পারব তখন সমস্ত গল্পটা আগাগোড়া এসে বলব তোমায়। তুমি শুনবে তো?"

কান্তি ভরাট দৃষ্টি দিয়ে তাকালো অলকার মুখে।

"শুনব বইকি! আপনি বলবেন, আমি শুনব না?" জবাব দিল অলকা। "আপনার কথা শুনব না—কি বলেন!"

এবং এই কথা বলে' কুমারী অলকা দত্ত নিজের ব্যাগ হাতে নিয়ে তেমনি নিঃশব্দ আওয়াজে নীচে নেমে গেল।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই কান্তি টেলিফোন হাত করেছে: হ্যালো, এটা কি বিশ্ববার্তা অফিস? .য়্যাঁ?···বিশ্ববার্তা?···বড়কর্তার ঘরে দাও।···ও—আপনি?···বড়কর্তা?...আমি—আমি কান্তি। কাশি-পুরের রহস্য আমি সমাধান করেছি।···"

বলেই কান্তি মুহূর্তখানেক কান-খাড়া করে' রইলো—প্রতীক্ষা করতে লাগল। কিন্তু থরহরিবাবুর কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য পাওয়া গেল না। অবিচলিত সুরে তাঁর জবাব এল:

"কালু সেন কি ধরা পড়েছে?"

"থরহরিবাবু, কেবল কালু সেন নয়, এই মৃত্যু রহস্যের আগা-গোড়া আমি ধরেছি। ধরতে পেরেছি।—" কান্তি বলল, তার বলার কায়দায় আর প্রত্যেকটি কথায় বিশেষত্ব দিয়ে—বিশেষ ব্যঞ্জনা দিয়ে বলল কান্তি—"কার মৃত্যু তা সকলেই আমরা জানি খুড়ো কৃত্তিবাস মরেছেন, এইটুকুই জেনেছি কেবল। এবং এও জানা গেছে যে কৃত্তিবাসের ভাইপোই তাঁকে মেরেছে। কিন্তু কেন মেরেছে, কি ভাবে মেরেছে এবং সেই ভাইপোই বা কোথায় এখন অবধি তার কিছুই আমরা জানতাম না। মৃত্যু-কাহিনীর এই পরিচ্ছেদগুলো পাওয়া যাচ্ছিল না। এই পরিচ্ছেদগুলোকেই আমি পাকড়েছি, এই কথা বলতে চাই আপনাকে।"

"বটে? বেশ তো।" অচঞ্চল স্বরে বললেন থরহরি। "বেশ।"

"এবং এই কাহিনীটাই আগাগোড়া, পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ আপনাকে আমি শোনাতে চাই।"

"কিন্তু এই টেলিফোন কানে শোনা তা কি সম্ভব হবে? যদি হয় তো শোনাও। দু'মিনিটের মধ্যে সারতে পারলে আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু দু'মিনিটে রামায়ণ গান, স্বয়ং রামচন্দ্র কান পাতলেও বোধ হয় শোনানো যায় না। কান্তি খানিক ইতস্তত করে, স্বভাবতঃই কিন্তু বেশিক্ষণ সে ইতস্তত করে না।

"গল্পটা টেলিফোনে না বলে' বিলিয়ার্ডের টেবিলে বললে বোধ হয় ভালো শোনাবে। সচিত্র করে' বলা যাবে হয়তো।"

"তার মানে?" থরহরি প্রশ্ন করলেন।

"তার মানে, আপনি বিশ্ববার্তা থেকে সোজা আপনার বাড়ীতে আসুন। আমিও যাচ্ছি। সেখানে আমাদের দু'জনের বিলিয়ার্ড খেলার ভেতর দিয়ে আমার বক্তব্যটা ব্যক্ত করব। এই ব্যাপারটার এমন কতকগুলি বিশেষ দিক আছে যা বিলিয়ার্ডের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে না দেখলে ধরা পড়বে না। যদি আপত্তি না থাকে, আপনাকে পঞ্চাশ পয়েন্টের খেলায় চ্যালেঞ্জ করতে আমি প্রস্তুত— তার মধ্যেই খেলা এবং গল্প দুই আমার শেষ হবে। বেশিক্ষণ আপনাকে কষ্ট দেব না।"

থরহরি বললেন: "বেশ।"

'শেষ হোলে তো ভালোই, নইলে তোমাকেও আমি শেষ করব।'—সেই সঙ্গে এই কথাও তিনি মনে মনে বললেন কিনা কে জানে। থরহরির দুর্গম মনস্তত্বে প্রবেশ লাভ করা যে কোন কল্পনা-কুশল লেখকের পক্ষেও অসাধ্য।

থরহরিকে বিলিয়ার্ডে চ্যালেঞ্জ করা একটা যা তা নয়। তাঁর মতো ধীর মাস্তিষ্ক এবং দৃঢ় প্রতিজ্ঞ খেলোয়াড় কলকাতায় খুব কমই

আছে। তাঁকে বিলিয়ার্ডে হারাতে কদাচ কেউ পেরেছে। এক-চোটে নয়, দশ এমন কি বারো পর্যন্ত মারবার তাঁর সুখ্যাতি শোনা যেত। টেবিল থেকে বল উড়িয়ে দেওয়া তো তাঁর পক্ষে অতি সহজ ব্যাপার। তিনটে বলের কে কোথায় রয়েছে তাঁর শ্যেন-দৃষ্টির কাছে এড়াবার যো ছিল না—এবং তাদের কোনটাকে কি ভাবে পিটতে হবে স্বভাবতই তিনি বুঝতে পারতেন।

তবে কান্তিও প্রতিপক্ষ হিসাবে কিছু কম ছিল না। আনাড়ির মার বলে' একটা কিছু আছে—কান্তির ছিল সেই সুবিধা। কান্তি একদম আনাড়ি। বিলিয়ার্ডের বিষয়ে অল্পদিনের পুঁথিগত বিদ্যা তার। তবে সাংবাদিকরা পারে না কি? হয়কে নয় করতে তাদের তুল্য কে আছে? সংবাদপত্রের রিপোর্টারের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। কাজেই, এর আগে কখনো না খেললেও' কান্তি কোন অংশে কম যায় না।

কান্তির অদ্ভুত বিলিয়ার্ডি চাল! কুশনের আড়ালে নিজের বল রেখে, প্রতিপক্ষের আঘাত থেকে রক্ষা করছে এবং তার নিজের মারের বেলায় সেই বল হয় সবেগে নয় একলাফে ধারের পকেটে গিয়ে স্থান লাভ করেছে।

স্কোর খুব চটপট বেড়ে উঠল—দুজনেই প্রায় সমান সমান। আধ ঘণ্টা খেলার শেষে এরও দশ ওরও দশ। থরহরি তাঁর ভারী মুখ আরো ভার করে উঠে পড়ে লেগেছেন—টেবিলের ওপরে তাঁর এক পা। কান্তি, উত্তেজনার চূড়ান্ত সীমায় উঠেও অতীব শান্ত, বলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছে। বল আর তার চোখের মধ্যে এক ইঞ্চির ফারাক।

পনেরর সময়েও তারা সমান। থরহরি হঠাৎ একচোটে তিন পয়েন্ট মেরে বসেছে কিন্তু এ চোটও সামলে নিয়েছে কান্তি। আরো মিনিট কুড়ির খেলার পর দুজনে উনিশে এসে আবার সমকক্ষ হয়েছে।

কিন্তু কান্তিকুমার মিত্রের মনে খেলায় জেতা ছাড়াও অন্য আরো কিছু বুঝি ছিল। এইবার সেটা পরিষ্কার হয়ে পড়ল। তার সুযোগ এল এতক্ষণে। দক্ষ হাতের এক মারে, খুব ওস্তাদও কদাচ যা পারে, কান্তি থরহরির বলকে বেশ একহাত দেখে নিল। লাল বলটা পকেটের হাঁ-এর মুখে গিয়ে দাঁড়ালো। সাদা বলটা টেবলের ঠিক মাঝখানে।

কান্তি থরহরির মুখের দিকে তাকিয়ে।

বলগুলি ঠিক সেই অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে—কৃত্তিবাসের মৃত্যু-তিথিতে তার বাড়ীর টেবিলে ঠিক যেমনটি করে' দাঁড়িয়েছিল।

"আমি ইচ্ছা করেই ওরকমটা করেছি।" বলল কান্তি। সহজ সুরেই বলল।

"তার মানে?" জিজ্ঞেস করলেন থরহরি।

বলের ঐরূপ অবস্থা দেখেও তিনি যে কিছু দুর্বল হয়েছেন তা মনে হোলো না।

"তার মানে, ঐ বলের মধ্যেই রয়েছে।" কান্তি জানাল। থরহরিবাবু আসুন, এবার একটু বসা যাক। আপনাকে আমার কয়েকটি কথা বলার আছে। অবশ্যি যা বলব তা আপনার অজানা নয়। আপনি বুদ্ধিমান, ইতিমধ্যেই তা আঁচ করতে পেরেছেন।"

কান্তির কথাতেও বেশ আঁচ। তার ভেতরে যে আগুন জ্বলছিল তারই আঁচ বোধ হয়। কান্তি আজ অগ্নিকাণ্ড না করে' ছাড়বে না। যে থরহরি, সারা বিশ্ব মায় বিশ্ববার্তাকে থরহরি-কম্পিত করে' রাখেন তার সামনে দাঁড়িয়ে এখনো সে অকম্পিত।

দুজনে মুখোমুখি দুটো কুশন অধিকার করে বসল। থরহরি শান্তভাবে একটা সিগ্রেট ধরালেন। মনে হোলো তাঁর হাত যেন একটু কাঁপল—সিগ্রেট ধরানোর সময়ে। চকিতের জন্যই মনে হোলো কান্তির।

"বেশ।" সিগ্রেট মুখে তিনি প্রশ্ন করলেন—"কি বলতে চাও বলো ?"

"থরহরিবাবু,—" কান্তির কান্তি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে মনে হয়—"দু'সপ্তাহ আগে আপনি আমাকে এক জটিল রহস্য সমাধানের ভার দিয়েছিলেন। তার কিনারা আমি করেছি। আজ রাত্রে—এই মুহূর্তে—এখনই সেই সমাধান আপনাকে জানাতে পারি। আপনি কি জানতে চান ?"

থরহরির কপালে কি কপোলে একটিও রেখা পড়ল না।

"বেশ তো।" বললেন তিনি। "জানাই যাক্ না!"

'একটা মানুষের জীবন বিলিয়ার্ড খেলায় শেষ করে' দেয়া যায় —স্বচ্ছন্দেই যায়—তাই না, থরহরিবাবু ?" কান্তি বলে : "আপনার কাছে অপরের জীবনের দাম বিলিয়ার্ডের চেয়ে বেশি নয়—তাই নাকি ?"

"তার মানে ? তুমি বলতে চাও কি ?" এইবার থরহরির হুঙ্কার শোনা গেল : "তুমি কি বলতে চাও শুনি ?"

"তার মানে তুমি—তুমিই খুন করেছ কৃত্তিবাসকে।" কান্তি বলল দৃঢ়স্বরে। থরহরির সামনে দাঁড়িয়ে কোত্থেকে যে, কেবল স্বরে নয় ব্যঞ্জনাতেও তার দৃঢ়তা এল কে জানে! এবং নিজের আমিত্বের পুষ্টির সাথে সাথে থরহরির সঙ্গে আপনা-আপনিত্বও যেন সে ভুলে গেল। স্রেফ তুমিত্বে তাকে পর্যবসিত করতে একটুও তার দ্বিধা হোলো না।

"তুমিই—বিশ্ববার্তা-পরিচালক শ্রীযুক্ত বাবু থরহরি দত্ত—দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশীল, চক্রান্তকারী এবং বদমায়েস—এতদিনে তোমার স্বরূপ এবং চাল-চলন প্রকাশ পেয়েছে! তুমি ধরা পড়েছ।"

থরহরির বিপক্ষে তার মানে তার নিজের অগোচরে এতদিন ধরে তার এত রাগ এবং এত বেশি বিরাগ পুঞ্জীভূত হয়েছিল তা কান্তি নিজেই জানত না—কিন্তু কেন যে হয়েছিল তা না জানলেও

—এবার তা প্রকাশের সরল এবং সঙ্গত পথ পেয়ে তার সমস্ত উষ্মা যেন লাভা প্রবাহের মত টগ্‌বগ্‌ করে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। থরহরিকে ধরে' থোড়ের মত কুচি কুচি করে কাটতে পারার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে তা সে জানত না। হাতীকে কাত দেখতে পেলে হস্তাদলিতদের যে অপার্থিব আনন্দ দেখা যায় এ বুঝি সেই আনন্দ।

"কুচক্রী, ভণ্ড এবং বিশ্বাসঘাতক—বাবু থরহরি দত্ত ওরফে—তোমার আসল নাম বলতে আমার কোনো কুণ্ঠা নেই আর—ওরফে কালু সেন—তুমিই হচ্ছে কৃত্তিবাস সেনের হত্যাকারী।"

তবু, তথাপিও থরহরির কপালের একটি শিরাও কাঁপল না। একটিও কথা না বলে' তিনি উঠে দাঁড়ালেন। কান্তিও উঠে দাঁড়াল সেই সঙ্গে। একটিও কথা না বলে' থরহরি কান্তির গালে সজোরে এক চপেটাঘাত করলেন। সেই থাপ্‌পড়টাই যেন তাঁর একটি মাত্র কথা। যারপর-নাই কথা।

"তার মানে?" কান্তি গালে হাত বুলোতে বুলোতে বলল।

"তার মানে, শ্রীমান কান্তিকুমার মিত্র, তুমি একটা মিথ্যুক।" এই বলে থরহরি আবার নিজের কুশনে বসে পড়লেন।

কান্তিও বসল—নিজের কুশনটা সরিয়ে নিয়ে এবার। থরহরির চড়টা তখনও গালে জ্বলছিল।

"কেবল মিথ্যুক নও, তুমি আস্ত একটা ধাপ্পাবাজ। কিন্তু কোথায় এসে চালাকি করেছিলে তা টের পাও নি। পীরের কাছে মামদোবাজি চলে না। তুমি যে আসলে কে, তা গোড়া থেকেই আমার জানা ছিল—তোমার এই গোয়েন্দাগিরির প্রহসন সুরু হবার সময় থেকেই। তুমি জানো না কিন্তু জেনে রাখ যে তোমার প্রত্যেকটি পদক্ষেপের ওপর লক্ষ্য রাখা হয়েছিল, কোথায় তুমি যাও, কি করো না করো—তোমায় সমস্ত চাল-চলনের ওপরে পুলিসের কড়া নজর ছিল। কান্তিকুমার মিত্র আসলে যে কালু সেন ছাড়া

আর কেউ নয়, তা আমাদের অজানা ছিল না। তিন বছর আগে কালু সেন কৃত্তিবাস সেনের গৃহত্যাগ করেছে, আর অজ্ঞাত-কুলশীল কান্তি মিত্রেরও ঠিক তিন বছর আগেই সাংবাদিকরূপে অভ্যুদয়। অতএব কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেন, আমার বন্ধু নিহত কৃত্তিবাস সেনের হত্যার জন্য তোমাকেই আমি দায়ী করি। তবে তোমাকে পুলিসের হাতে দেয়া না দেয়া আমার ইচ্ছাধীন। আমার নিজের হাতেই তোমাকে আমি শেষ করতে পারি।" একটানা এত বড় একটা বক্তৃতার পর—তাঁর জীবনে এত অধিক বাক্যব্যয়ের বাহুল্যতা এই প্রথম—থরহরি ক্লান্ত হয়ে পড়েন। তাঁর নিজের হাতে কান্তি মিত্র ওরফে কালু সেনকে আরেকবার শেষ করার বাসনা প্রবল হলেও তেমন কোন উদ্যম দেখা যায় না।

এবার কান্তি মিত্র কুশন ছেড়ে উঠে এসে তাঁর নাকে এক ঘুষি লাগায়।

"মিথ্যাবাদী!" চেঁচিয়ে ওঠে কান্তি ঃ "আমি কালু সেন নই। কক্ষণো না।"

ঠিক এই মুহূর্তে থরহরির জনৈক ভৃত্য দরজা ফাঁক করে' প্রবেশ করে।

"একজন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান, কর্তা।" সে জানায়।

"কে!" থরহরি জিজ্ঞেস করেন। নাকের সুশ্রূষা থামিয়ে।

"আমি চিনি না, তবে তাঁর এই কার্ড দিয়েছেন।"

থরহরি দত্ত কার্ডটি হাতে নিলেন। কার্ডের ওপরে স্পষ্টাক্ষরে মুদ্রিত ঃ—কালু সেন।

কার্ডদৃষ্টে থরহরি এবং কান্তি দুজনে দুজনের দিকে তাকালো —দুটি জিজ্ঞাসা চিহ্নের মতো। কস্তং? তাহলে কে তুমি—এই যেন প্রশ্ন।

একটু আগে যেখানে তত্ত্বমসির লড়াই চলেছে, তুমিই সেই—সে ছাড়া আর কেউ না—এহেন উচ্চ দার্শনিকতা দেখা গেছে, কার্ডের পৃষ্ঠে দেগে দেয়া 'কালু সেন' এই দুটি কথায় তা যেন আলোর উদয়ে মসীর তত্ত্বের মত তুচ্ছ, হয়ে গেল। সোহংএর আবির্ভাবে তছনছ হয়ে গেল সব।

লোকটাকে উপরে নিয়ে এস!" বললেন থরহরি।

মিনিট দুই পরে লোকটা এল। কান্তির শ্যেন চক্ষু কালু সেনকে বিক্ষত করতে লাগল। তার সবুজরঙা পোষাক, রোদ-চটা তামাটে মুখ, আর লম্বা লম্বা আঙুল দেখলে লোকটা কি কাজ করে সে সন্দেহ থাকে না। জাহাজের খালাসী বলে সহজেই চেনা যায়।

"বোসো।" বললেন থরহরি।

"ধন্যবাদ।" বলল সেই খালাসী: "বসতে পারলে বাঁচি। আর কিছু না, আমার কাঠের পা-টা একটু স্বস্তি পায় তাহলে।"

থরহরি আর কান্তি আবার পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করলো লোকটার একটা পা কাঠের দেখে বিস্ময়ে কান্তি কাঠ হয়ে গেল, আরো দেখল, যা-তা কাঠ নয়, চন্দন কাঠ। লোকটা (দয়া করে বা চটে গিয়ে) কারো গায়ে যদি পা ঘষে দেয় তাহলে সে পদাহত ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ গন্ধে ভুর ভুর করবে। এটা কেবল কাঠের সত্য নয় কঠোর সত্য।

"আমি এডেন থেকে আসছি।" উপবিষ্ট হয়ে কালু জানাল।

ঘাড় নাড়ল কান্তি। "এখন দেখতে পাচ্ছি।" বলল সে: "থরহরি—থরহরিবাবু, আপনার সম্বন্ধে আমার ধারণা ভুল। মূলত যে এটা এডেনাগত কাঠের এক-পা-ওয়ালা একজন লোকের কাজ আগেই তা আমাদের ঠাওর হওয়া উচিত ছিল। সে ছাড়া আর কারো কীর্তি নয়! এ ছাড়া অন্য কাউকে ঠাওর করতে যাওয়াই আমাদের অন্যায় হয়েছিল।"

"সমবেত ভদ্রমণ্ডলী—" কাঠের পা টাকে আরামে রেখে নড়ে চড়ে বসে কালু আরম্ভ করে :—

"আমি আমার জবাবদিহি করতে এসেছি। আমার স্বীকারোক্তি শুনুন। যদিও সাধারণতঃ পুলিসের শিকার হবার পরই এই উক্তি করাটা দস্তুর—কিন্তু আর সময় নেই। আমি নিজেই আমার শিকার—দুর্ভাগ্যের শিকার। যতদূর মনে হয়, আমার আর বেশি সময় নেই। এখানকার—ঠিক ইহলোকের কি না জানি না—তবে এখানকার খাঁচা থেকে এখনই আমাকে উড়তে হবে।...যতক্ষণ সময় আছে আমার শেষ কথাটা শেষ করে নিই।

"সে কি!" কান্তি সবিস্মিত হয়ে ওঠে : "তুমি কি অন্তিমক্ষণে এসে উপস্থিত হয়েছ? শেষ মুহূর্তে এসে দেখা দিয়েছ আমাদের?"

"তাই কি স্বাভাবিক নয়? সেইটাই ঘটে না কি সচরাচর?" পালটা প্রশ্ন এল কালুর দিক থেকে। "আপনারাই বলুন।"

"হ্যাঁ, তাই ঘটে থাকে বটে।" কান্তি ঘাড় নাড়ল : "তাহলে নিশ্চয়, তোমার বক্তব্যের মাঝে মাঝে গলার ঘড়ঘড়ানি উঠে তোমাকে বাধা দেবে বোধ হচ্ছে? হয়তো বেদম কাশিও আসতে পারে—তাই না?

"আপনি সর্বজ্ঞ। আপনাকে নমস্কার।" কালু সেন পা তুলবার চেষ্টা করল, পারল না। অগত্যা কেবল হাত তুলেই নমস্কার জানাল। "ঠিকই ধরেছেন আপনি।...তবে গলার ঘড়-ঘড়ানিটা আমি উপসংহারের জন্যে রেখেছি। বেদম কাশিটা মাঝে মাঝে আমদানি করব বটে, তবে তার দেরি আছে।"

"গাল বেয়ে রক্তও গড়িয়ে পড়তে পারে? য়্যাঁ?" থরহরির আশঙ্কা হয়—তকতকে মেজের দিকে তাকিয়ে।

"আজ্ঞে না, অতোদূর গড়াবে না।" জবাব দিল কালু : "এবার তাহলে আত্ম-জীবনী সুরু করা যাক। বাল্যকালের থেকেই আরম্ভ করি—কেমন?"

"না না, দোহাই, তা কোরো না।" কান্তি এবং থরহরি সমস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে। এমন কি এতদিনের ও এত কাণ্ডের অকম্পিত থরহরিকে থরথর করে কাঁপতে দেখা যায়।

কালু সেন ভ্রূকুঞ্চিত করে। "আমার ধারণা, আমার আত্ম-জীবনী শোনাবার ন্যায্য অধিকার আমার আছে।" সে বলে। "যে লোকটা একজন লোকের প্রাণ নিয়েছে এবং অপর এক জনের —মানে, নিজের—প্রাণ দিতে চলেছে—প্রাণের আদান-প্রদান যার কাছে এমন অকাতর এবং তুচ্ছ—তার যা খুসি সবাইকে শুনিয়ে দেবার অধিকার আছে বই কি। এটা বার্থ-রাইট না হতে পারে, কিন্তু ডেথ-রাইট যে তাতে সন্দেহ কি? অতএব আমার কাহিনী আপনাদের শুনতে হবে। শুনতেই হবে—না শুনে উপায় নেই।"

তের

॥ কালুর কালোয়াতি ॥

'ছোটবেলা থেকেই আমার দুর্দান্ত স্বভাব।" কালু বলতে থাকে: "যখনই যা মনে হয়েছে তাই করেছি। তখন তখনই যদি কেউ আমাকে শাসন করত—আমার স্বভাব শোধরাবার চেষ্টা করত তাহলে বোধ হয়—"

"কিন্তু তা করা হয় নি।" থরহরি বাধা দ্যান: "তারপর?"

"আমার কাকার তিন কূলে একা আমিই ছিলাম। আর কাকার ছিল অগাধ ঐশ্বর্য্য। অপর্যাপ্ত বিলাসের মধ্যে ছোটবেলা থেকে বর্দ্ধিত হয়ে, কোনোদিন যে আমাকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে বা তার প্রয়োজন হবে, তা বোধ করিনি।—

"ভালো কথা," কান্তি সব কিছুই চুলচেরা খতিয়ে দেখার পক্ষপাতী, বাধা দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করে: "তখন তোমার কটা পা? পায়ের সংখ্যা কত ছিল?"

"তুই। মাত্র তুই। ভগবদ্দত্ত সবার যেমন থাকে। কিন্তু অল্পদিনেই বিলাস-ব্যসনের চূড়ান্তে উঠতে গিয়ে—"

"তোমার পা ফস্‌কালো। মানে একটা পা।" থরহরির পাদটীকা: 'কালুভায়া, চট্‌পট্ তোমার আসল কথায় এসে পড়ো। আমার খিদে পেয়েছে।"

"এই এলাম।" বলল কালু: "দেরি নেই। কিন্তু মহাশয়রা যতদূর মনে করেছেন ততটা না। খারাপ আমি ছিলাম বটে, কিন্তু একেবারে খারাপ ছিলাম না।"

"না না। তা তো নয়ই।" থরহরি এবং কান্তি সান্ত্বনার ছলে সায় দিল: 'তা কে বলছে? পরের টাকা এবং দুশ্চরিত্র সকলেই বেশি বেশি ছ্যাখে কিন্তু তাহলেও শতকরা নিরনব্বই জনের চেয়ে বেশি খারাপ তুমি ছিলে না।"

"এমন কি আমার জীবনেও ভালোবাসা দেখা দিয়েছিল। যেমন প্রত্যেকের জীবনেই দেখা দেয়। কিন্তু প্রত্যেকের জীবনে ভালোবাসা এলেও ঠিক তেমনটি আসে কি না সন্দেহ আছে। তেমনটি আমি কখনো দেখি নি। এডেনেও না, এমন কি, বসোরাতেও নয়। তাকে দেখলে মনে হয় যেন মূর্ত্তিমতি করুণা। সেই কাশির মহিষি করুণার মত। সে যেমন গরীবদের কুটীরে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল ইনিও তেমনি গরীবের মনে—বেশি আর কি বলব? যেন রবীন্দ্রনাথের সেই 'আনন্দময়ী মুরতি তোমার কোন্ দেব তুমি আনিলে দিবা?' তিন বছর আগে সেই করুণা আমার কাকার বাড়ীতে এল—"

"জানি, জানি! টাইপিস্‌টরূপে।...তারপর?" কান্তি অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।

"তারপর আমি—আমি তাকে না ভালোবেসে পারলুম না। প্রথমে বোনের মত—তারপর বন্ধুর মত—তারপর—"

"তারপর যৎপরোনাস্তি—ঠিক যেমন হয়ে থাকে। তারপরে

তারপরের যোদ্ধা কথাটা আমরা শুনতে চাই।” থরহরি বললেন। “যদি বলতে চাও তো বলো।”

“তারপরে একদিন তাকে নিয়ে আমি সিনেমায় গেলাম। আমার কাকা, কি করে’ জানি না, সেটা টের পেলেন। সিনেমার ওপরে তিনি হাড়ে চটা ছিলেন। সিন আর সিনেমা তাঁর ধরণায় ছিল এক জিনিষ, এমন কি সইস কোচম্যানদেরও তিনি সিনেমা দেখার ছুটি দিতেন না—পাছে তারা ঘোড়াদের বখিয়ে দেয়—”

“ঘোড়ার কথা থাক,” কান্তি বলল : “তোমার কথা বলো। কাকা ঐ কাণ্ড টের পাবার পর কি হোলো তাই শুনি ?”

“ভারী তিনি চটে গেলেন। এমন কি ঐ নিয়ে আমাদের মধ্যে ভীষণ কলহ পর্যন্ত হয়ে গেল। শেষে তিনি আমাকে ত্যজ্যপুত্র করে’ দিলেন।—”

“ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র। তাই নাকি।” কান্তি ভ্রমসংশোধন করে।

“ত্যজ্য ভ্রাতুষ্পুত্র করে’ তাঁর অগাধ সম্পত্তির উত্তরাধিকার থেকে আমাকে বঞ্চিত করে’ ঘাড় ধরে’ তাঁর বাড়ী থেকে আমাকে তিনি বার করে’ দিলেন। তাড়িয়ে দিলেন আমায়।”

কালু থামল, এইবার সেই পূর্ব প্রতিশ্রুত কাশির ধমকটা দেখা দেবে বলে’ কান্তি মিত্রের মনে হয়। থরহরি একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাঁর সহানুভূতি জ্ঞাপন করেন। বোধ হয় এই তাঁর জীবনের প্রথম দীর্ঘনিশ্বাস। নিজের জন্য যা কখনই তাঁকে ফেলতে হয়নি কোনো কারণ ঘটেনি ফেলবার, অন্যের গৃহ-বিতাড়িত হবার দুঃখে অনেক দিনের জমানো সেই দীর্ঘনিশ্বাস এই সুযোগে তিনি পরিত্যাগ করেন।

কালু সেনও দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরম্ভ করে আবার।

“ছোটবেলায় আমার আরেক ভালোবাসা ছিল। শিশুর থেকে আমি সমুদ্রকে ভালোবাসতে শিখেছিলাম।”

“কোন্ শিশুর থেকে ?” কান্তির সাগ্রহ প্রশ্ন।

"সমুদ্রের প্রতি টান আমার ছোটবেলার। নৌকো দেখলে তার আগে আগে আমি ছুটতাম।"

"নৌকোর পাল?" কান্তি আরও অবাক হন এবার। "তোমার সামুদ্রিক পরিভাষা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। নৌকোর পাল আবার কি? নৌকোরাও কি গোরুর মতন পালে চরে নাকি? আর চরলেও, তাদের আগে আগে না ছুটে পিছনে দৌড়নোর বাধা ছিল কি?"

কালু সেন কান্তির কোনো জবাব দিতে পারে না। কাশতে আরম্ভ করে। জবাব দিতে পারে না বলেই কাশিবাস সুরু করে বোধ হয়।

চোদ্দ

॥ কার্য্য এবং কারণ বনাম কারণ এবং কার্য ॥

কাশির অনর্গলতা কমলে কালু জানায়: "সব পালাটা শুনুন আগে আমার। তারপর বলবেন। কাকা আমাকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলে আমার সেই বাল্যকালের ভালোবাসা মনে পড়ল। সমুদ্রকে সত্যিই আমি ভালোবাসতাম। শিশু পাঠ্য বই পড়ে যে যে ভালোবাসা জন্মেছিল, সিনেমায় সমুদ্রের ছবি দেখে জমে জমে তা বেড়ে উঠেছিল অনেকখানি। একটা জাহাজে খালাসীর কাজ নিয়ে যেদিকে দু চোখ যায় আমি বেরিয়ে পড়লাম। প্রথমে গেলাম যবদ্বীপের দিকে। সেখানে মলয় উপকূলে এক সামুদ্রিক ডাকাত আমার একটা পা ছিঁড়ে নিল। ভাগ্যিস মলয় বনে চন্দন সস্তা, তাই আসল পায়ের চেয়েও দামী, চন্দন কাঠের এই মূল্যবান পদ আমি লাভ করেছি।—"

"তুমি তো মরতেই যাচ্ছ। যখন তোমার অন্তিমক্ষণ এসেছে

তখন শেষ পর্যন্ত তোমাকে মরতেই হবে। যদি কিছু না মনে করো তাহলে স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ তোমার পা থেকে একটুখানি আমি কেটে নিতে চাই। আমার এক পিসীর ভারী পূজো-আর্চ্চার বাতিক, তিনি পেলে খুব খুসী হবেন। কেটে নিলে তোমার লাগবে না তো?" কান্তি জিজ্ঞেস করে।

"পায়ে লাগবে কিনা জানি না। তবে মনে লাগবে। কত কষ্ট করে এই পা বানানো।" কালু জানায়।

"তবে থাক, থাক। দরকার নেই।"

"এইবার আমি সেদিনের ঘটনায় আসব। কিছুদিন আগেকার সেই ঘটনায়। আমার কাহিনীকে আর অযথা বাড়াতে চাই না। থরহরিবাবুর বোধ হয় খাবার সময় হয়েছে, খিদেয় ছটফট করছেন মনে হচ্ছে। এবার এক কথায় সেরে ফেলব। জাপানী আক্রমণ সুরু হইতেই—তিন বছর আগের কথা বলছি—আমরা মলয় থেকে পাত্তাড়ি গুটিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার দিকে রওনা দিলাম। তারপর এই আড়াই বছর ধরে নানা দেশের নানান উপকূলে ভিড়ে নানাবিধ জীবনযাত্রা দেখে অবশেষে একদিন এডেন হয়ে আমাদের জাহাজ করাচীর বন্দরে এসে পৌঁছল।"

"আমরা জানতাম।" বলল কান্তি।

"আপনাদের অজানা কি আছে? গোয়েন্দারা কী না জানেন, তারপর যা বলছিলাম। করাচীতে জাহাজ এলে আমি কিছু দিনের ছুটি নিলাম। ছুটি নিয়ে রেলে চেপে এসে পৌঁছালাম কলকাতায়।—

"আসবার পথে কি তুমি কাশি হয়ে এসেছিলে নাকি?" কান্তি বাধা দিয়ে প্রশ্ন করে।

"কাশি? না তো। কাশি হয়ে আসিনি—এসেই কাশি হোলো। এই মারাত্মক কাশিটা।...তারপর যা বলছিলুম।...

কথা ছিল, করাচী থেকে আমাদের জাহাজ কলকাতার ডকে

যেমন এসে পৌঁছবে, তেমনি আমারো ছুটি ফুরোবে। আমি এখান থেকেই জাহাজে আমার কাজে যোগ দেব। আমি দেখলাম, এই সুযোগ।—"

"খুড়োর গঙ্গা যাত্রা করবার। তাই না?" কান্তিও যোগ দেয়।

"ঠিক ধরেচেন।···কলকাতায় আমার ভূতপূর্ব বাড়ীতে ফিরলাম বটে, কিন্তু কী গেছলাম আর কী এলাম! তিক্ত মন, আশাহীন জীবন, দেহের ভগ্নাবশেষ নিয়ে এ কী ফিরে আসা! কেবল এক-মাত্র এই চিন্তা তখন আমার মনে ছিল—আমার এই সর্বনাশের জন্য যিনি দায়ী আমার সেই কাকাকে এবার নিকেশ করে যাব।"

আবার দ্বিতীয়বার কাশিটা এসে ধমক দিতে লাগল কালুকে। কাশতে কাশতে অস্থির হয়ে পড়ল বেচারা। থরহরি আর কান্তি উভয়ে উভয়ের দিকে কটাক্ষ করলেন। যার মর্ম হচ্ছে, লোকটা শেষ কথা বলার আগেই বলা শেষ করবে? খক্‌খকানি যে আর থামে না!

পনের

॥ কাশির উপসংহার ॥

কাশির ধমকানি শেষ হলে কালু সেনের সুরু হোলো:

"সন্ধ্যের পরে অন্ধকার বেশ জমাট হয়ে এলে আমি কাকার বাড়ীর মাটিতে পা দিলাম। রাত তখনো বেশি হয়নি, কিন্তু কাকার প্রিয় ভৃত্য উদ্ধবের টিকি দেখা গেলনা। তাতেই বুঝলাম কাকা বেরিয়েছেন। কাকা বাড়ীর বাহির হলেই উদ্ধবের পাড়া-বেড়ানো আরম্ভ হয়। কাকা বাড়ীর গাড়ীতে বেরোননি বোঝা গেল, কেননা গাড়ী ঘোড়ারা আস্তাবলেই ছিল, কিন্তু তারা থাকলেও সহিস কোচ-

ম্যানরা ছিল না। একটা ঘোড়া আমাকে দেখে চিনতে পারল কি না জানি না, কিন্তু হ্রেষারবে সেই আমাকে প্রথম অভ্যর্থনা জানাল।

"সদর দরজা খোলাই পড়েছিল, ইচ্ছে করলে স্বচ্ছন্দে সেই পথেই বাড়ীতে ঢুকতে পারতাম। কিন্তু যে খুন করতে এসেছে তার ওভাবে গৃহ-প্রবেশের কোনো মানে হয় না। ঝোপ ঝাড়ের আড়াল থেকে কাজ সারাই তার উপাদেয় বলে মনে হয়। কিন্তু কাকার বাগানবাড়ী নামেই বাগানবাড়ী, বাগান সেখানে নামমাত্র, ঝোপ-ঝাড়ের অস্তিত্বই নেই। কিন্তু যেখানে ঝোপঝাড় নেই, আর যখন সদর দরজা খোলা, এবং কেউ নেই কোথাও, তখন কি করি? অগত্যা আমার কাঠের পায়ের সাহায্যে বাধ্য হয়ে আমাকে দেয়াল বেয়ে উঠতে হলো। অসাধারণ সাহসে ভর করে তাই উঠলাম। তাছাড়া পথ ছিল না। দোতলা পর্যন্ত উঠে একটা জানালা পাওয়া গেল। কাকার বিলিয়ার্ড ঘরের জানালা। জানালার কার্নিশে বসে' অসাধারণ কৌশলে তার ভেতরের খিলটা খুললাম। কৌশলটা আর কিছু না, ছুরি দিয়ে খড়খড়ি দু ফাঁক করে হাত গলিয়ে ভেতরের ছিটকিনিটা খুলে ফেলা। ইচ্ছে করলে সদর দরজা দিয়ে অনেক আগে বিলিয়ার্ড ঘরে পৌঁছে ভেতর থেকেই জানালাটা খুলতে পারতাম—ঢের সহজেই। কিন্তু কার্নিশে বসে খোলাটাই অসাধারণ। অন্য ভাবেও খোলা যেতো বটে, কিন্তু কাজটা খেলো হয়ে যেত। পরদিন সকালে পুলিসের লোকরা এসে কিসের এত অনুসন্ধান করত তাহলে? ক্লু খুঁজত কোথায়? অনুসন্ধান করবার মত কিছু না পেলে তারা বিরক্ত হত নাকি? ভাবত যে আমি তাদের হতাশ করেছি, তাদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করিনি, আমার উপযুক্ত কাজ আমি করিনি। মনে মনে তারা টিটকিরি দিত আমাকে। এই সব দিকে দৃষ্টি রাখা দায়িত্ব-জ্ঞানী হত্যাকারীর কর্তব্য। ভালোবাসার পথ যেমন অত্যন্ত সোজা, সহজেই যাওয়া যায়, কিন্তু ইচ্ছা করে' আমরা তাকে ঘোরালো করে তুলি, তেমনি

খুনখারাপির পথও। তার মধ্যে ঘোর প্যাঁচ না থাকলে কিছুই থাকল না। কোনো মার প্যাঁচ না করে' যদি মারা যায়, মারলেও সেটা মারা হলো না। খুনের অভিধানে সেটা অপকর্ম।—"

কান্তি হাঁ করে' কালুর মুখের থেকে এই হত্যা-তত্ত্ব শুনছিল—থরহরি তাদের দুজনকেই বাধা দিলেন। "ঢের হয়েছে। এখন আসল কথা শুনি।" তিনি বললেন। এইবার নিয়ে তিন বার।

রান্নাঘর থেকে ইলিশমাছ ভাজার গন্ধ এসে অনেকক্ষণ থেকে তাঁকে বিচলিত করছিল। না বলে' তিনি থাকতে পারলেন না।

"জানলা খুলে ফেলে তারপরে আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা নামালাম। খুনের নেশায় বুকের রক্ত তখন টগবগ করছে আমার। কিন্তু ভগবানকে ধন্যবাদ, তিনি আমাকে খুব বাঁচিয়েছেন। খুন আমাকে করতে হয়নি—"

"য়্যাঁ, এই যে বললে তুমিই করেছ? এখন আবার—?" কান্তি চেঁচিয়ে ওঠে।

"এখনো আমি কিছুই বলিনি। করেছি কি করিনি, আমার কাহিনী শেষ হলে আপনারাই তার বিচার করবেন। করেছি কি করিনি আমি নিজেও জানি না। আমি নিজেও তা জানতে চাই। আপনাদের কাছ থেকেই জানতে চাই। আপনারাই তার বিচারক।"

"আহা, বলতেই দাও না ওকে। তুমি আবার কেন বাধা দিচ্ছ?" বাধা দিয়ে থরহরি স্বয়ং এবার বলেন। বলেন কান্তিকেই।

"হ্যাঁ, যেমনি না আমি বিলিয়ার্ডের ঘরে পা দিয়েছি—তক্ষুণি সেই ঘরের বিজলি বাতি জ্বলে উঠল আর আমার চোখের সামনে দেখতে পেলাম—না, কাকে দেখতে পেলাম তা আমি বলবনা—তা আপনারা আমাকে খুনই করুন আর যাই করুন—সেই দেবীর বর্ণনা আমার এই পাপ মুখে আমি করব না। সেই দেবী বললেন—দেবীদের অজানা কী আছে? সকলের নাড়ির খবর তাঁদের হাঁড়িতে—দেবী বললেন আমায়—'পিলটু!—' আদর করে ঐ ডাক নাম

তিনি দিয়েছিলেন আমাকে—বললেন আমায়—"পিলটু, বুঝতে পেরেছি। তোমার কাকাকে তুমি খুন করতে এসেছ। ও কাজ কোরো না।" দেবীর ঐ কথায় আমার মন ঘুরে গেল, কেমন ঘুরে গেল। মত বদলে গেল আমার। আমি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলাম, ঠিক যেমন করে—যেমন করে—"

ভাষায় কুলিয়ে উঠতে না পেরে কালু সেনকে থামতে হয়।

থরহরি দাড়ি চুলকান!

"ঠিক যেমন করে হাবারা কাঁদে।" কান্তি বাৎলে দেয়। "তারপর বলে যাও।"

"কান্নাকাটি শেষ হলে, নীচে থেকে কাকার গলার আওয়াজ এল। 'চট্‌পট্‌—' বললেন সেই দেবী 'চট করে' কোথাও লুকিয়ে পড়ো। উনি যেন তোমায় না দেখতে পান।" এই বলে' দেবী পাশের একটা ঘরে পালিয়ে গেলেন। আমি চার ধারে তাকিয়ে কেবল একটা তাক দেখতে পেলাম। বেশ বড়ো-সড়ো তাক—পর্দা দিয়ে ঢাকা। পর্দার আড়ালে কোনো রকমে তার মধ্যে গুড়িসুঁড়ি মেরে লুকিয়ে থাকা যায়। আমি সেই তাকে গিয়ে উঠলাম! কি করে' উঠলাম বলব?"

"না। নিজেই আমি মাথা ঘামিয়ে বার করতে পারব।" কান্তি জবাব দিল: "যদ্দূর মনে হয়, তোমার ঐ কেঠো পা দিয়ে এক লাফে গিয়ে উঠে দাঁড়ালে?—অসাধারণ ক্ষিপ্রতার সাহায্যেই?—তাই না?"

কালু সেন জবাব দিল পা নেড়ে—সেই কেঠো পা খানাকেই নেড়ে চেড়ে জানাল যে তাই বটে।

॥ রহস্যভেদ ॥

"পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম কি হয়! কাকা এলেন, থরহরিবাবু এলেন। কাকা বললেন, এসো থরহরি একদান খেলা যাক।

থরহরিবাবু জানালেন যে তাঁর আপত্তি নেই। এক পেট খাওয়ার পর বিলিয়ার্ড খেলায় নাকি হজমের সাহায্য করে। এই নাকি তাঁর ধারণা।

তারপর দুজনের খেলা সুরু হোলো।

আমি ওঁদের খেলা লক্ষ্য করতে লাগলাম। পর্দায় একটা ছ্যাঁদা ছিল। তার ভেতর দিয়ে নিজে অদৃশ্য থেকেও সমস্ত কিছু দিব্যি দেখা যায়,—"

কান্তি বলল—"হ্যাঁ, পর্দার ছ্যাঁদাটা আমি দেখেছিলাম বটে। যদিও ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে কতদূর দেখা যায় না যায় লক্ষ্য করতে যাইনি।"

"ওই তো গোয়েন্দাদের গলদ। আসল লক্ষ্য ফেলে উপলক্ষের পেছনে আপনারা ছোটেন। যাই হোক দেখতে লাগলাম খেলাটা—কিন্তু খেলা আর শেষ হতে চায় না। এদিকে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার পা টনটন করতে লেগেছে। খেলতে খেলতে দুজনেই খুব মেতে উঠলেন—এবং দেখতে দেখতে তেতে উঠলেন দুজনেই। অবশেষে ঐ খেলা নিয়ে ঝগড়া বেধে গেল দুজনের। থরহরিবাবু হেরে গেছলেন। কালু ফাঁস করে দিল।"

থরহরি বাবু ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলেন: "সে যে সাদা বলটাকে—" তার বেশি তিনি বলতে পারলেন না। এতদিন পরেও সেই কথা ভাবতে গিয়ে ভাবাবেগে তাঁর কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে এল।

"ঠিক কথাই।" বলল কালু: "আমার কাকা লাল বলটা মারতে পারেননি। তাঁর ফসকে গেছল। কান্তিবাবু, সমস্ত বিলিয়ার্ডের

গবেষণাই তোমার ভুল। আগাগোড়াই গলতি। বিলিয়ার্ড খেলায় কেউ শেষ পয়েন্ট নিয়ে ব্যস্ত হয় না। তখনো টেবিলে দুজনেরই নিরনব্বই। থরহরিবাবু টেবিল ছেড়ে চলে গেছেন। আমার কাকা তারপরও লাল বলটাকে মারবার তাক করতে লাগলেন। একলা একলা সব বিলিয়ার্ড খেলোয়াড়ই যা করে। আধখানা মারে বলটাকে টপকে নিয়ে গিয়ে টেবিলের পকেটস্থ করা—এই চেষ্টাই তিনি করতে লাগলেন বারম্বার। কিন্তু কিছুতেই পারছিলেন না। কতো রকমভাবে তিনি করলেন। কিন্তু কিছুতেই বলটাকে কাবু করতে পারলেন না।"

"এই চেষ্টায় ক্রমশঃ তিনি দুর্বল হয়ে পড়লেন বোধ হয়? কান্তি জিজ্ঞেস করল। খুঁটিনাটির দিকে তার খর নজর।

"মোটেই না।...অবশেষে তিনি করলেন কি...আমি সেই পর্দার ছিদ্র ভেদ করে' দেখতে লাগলাম—অদ্ভুত এক কাণ্ড করলেন। পকেট থেকে রুমাল বের করে' গলায় জড়ালেন, ফাঁসের মত করে' জড়ালেন, আর সেই ফাঁসের মধ্যে বিলিয়ার্ডের কিউটাকে রাখলেন। 'এইবার বোধ হয় আমি পারব।' তিনি বললেন এইবার।"

"হ্যাঁ, এবার আমি বুঝতে পারছি।" বলল কান্তি।

"হ্যাঁ, এবার পারবেন।" কালু বলল: "গলায় কিউ বেঁধে বলটার পশ্চাতে এবার তিনি লাগলেন। খুব উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্ত, বুঝতেই পারছেন। খেলা দেখতে দেখতে আমিও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। কোথায় আছি, কি অবস্থায় আছি, কিছুই আমার মনে ছিল না। কাকার মারটা দেখবার জন্য পর্দা ফাঁক করে ঝুঁকে পড়ে দেখতে গেছি—আমার কাকা তাক করছেন আর আমি এক-দৃষ্টে তাকিয়ে—দুজনের এই তাকাবার মুহূর্তে তাক থেকে আমার পা ফসকে গেল। কাকা ছিলেন ঠিক আমার সামনেই, আমি তাঁর ঘাড়ে গিয়ে পড়লাম। কাকাও পড়ে গেলেন। আমাকে নিয়ে তিনি পড়লেন। পড়লেন মেজেয়।"

"এখন দেখা যাচ্ছে।" বলল কান্তিঃ "উপুড় হয়ে তিনি পড়লেন আর তাঁর মাথা ঠুকে গেল মেজেয়। আর গলার ফাঁসে আর কিউয়ে আটকে গিয়ে শ্বাস রুদ্ধ হয়ে তৎক্ষণাৎ তাঁর মৃত্যু ঘটল। বিলিয়ার্ডের লাঠি আর রুমালের ফাঁস—এরাই তার মৃত্যুর কারণ। এখন বুঝতে পারছি।"

"হুবহু তাই।" কালু জানাল। "তারপর যখন আমি এই দৃশ্য দেখলাম, দেখলাম যে তিনি অক্কা পেয়েছেন, আর এক দণ্ডও সেখানে দাঁড়াবার আমার সাহস হোলো না। কিউটাকে ছাড়িয়ে এনে কাকার গলার ফাঁসটা আরো ভালো ভাবে আমি এঁটে দিলাম। তাঁর হাত দুটো স্বামী বিবেকানন্দের ষ্টাইলে সাজিয়ে দিলাম। ওই ষ্টাইলটা আমার খুব ভালো লাগে। ওতে বুকে জোর পাওয়া যায়। তারপর—যেমন এসেছিলাম তেমনি বেমালুম সেস্থান থেকে আমি প্রস্থান করলাম।"

"তেমনি দেয়াল বেয়ে? না জানালা ডিঙিয়ে?" কান্তি প্রশ্ন করল।

"না, এবার সদর পথেই। খুন করলে অবশ্যি অন্য পথ নিতে হতো।"

"কিন্তু পিন দিয়ে তোমার কাকার বুকের কাছে গাঁথা সেই কাগজ খানা? যাতে সমস্ত সম্পতির উত্তরাধিকার তোমার নামে উইল করে দেয়া হয়েছে—সেটার কথাতো কিছু বললে না হে?"

"কি কাগজ? কই আমি তো তার কিছুই জানি না। তেমন কিছুই তো আমি লিখিনি। সে-সব লেখবার কথা আবার মনেও ছিল না। আমি তখন সেখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচি।"

"তুমি না লিখলে কে আবার তবে লিখবে? তবে কি আমি লিখেছি?" কান্তি এবার চটে যায়, তার ধারণার সঙ্গে খাপ খায় না বলেই বোধ হয়।"

"তা হলে—তাহলে কি সেই দেবী—সেই দেবীই কি ?"—কালু সেন এই পর্যন্ত বলেই থেমে যায়।

"তা হতে পারে। দেবীদের অসম্ভব কিছুই নেই।" থরহরি বলেন : "দেবীদের রহস্য দেবতারাও টের পান না।"

"তোমার কাকার ঐভাবে মারা যাওয়াটা দৈব-দুর্ঘটনা হতে পারে—কিন্তু ঐ কাগজের লেখাকে আমি দেবী-মাহাত্ম্য বলে মানতে প্রস্তুত নই।" কান্তি বলে।

"কালু, গল্পটা তুমি বানিয়েছ মন্দ নয়।" কিছুক্ষণ ভাবিত থেকে থরহরিবাবু বলেন : 'এপর্যন্ত যত খুনের কেচ্ছা আমার কাগজে বেরিয়েছে, তার সবকটাকে টেক্কা দিয়েছ নিঃসন্দেহ। কিন্তু তবু তোমার গল্পের এক জায়গায় গলদ আছে—একটা কথা কিছুতেই আমি বুঝতে পারছি না। তোমার কাকার গায়ে দুটি বুলেটের দাগ দেখা গেছে—তার মানে ? গুলির ঐ গর্ত দুটো এল কোথেকে ?'

"সাবেক কালের গর্ত। বহু পুরণো।" কালু ধীরে ধীরে বলে, "বলতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে, কিন্তু না বলিয়ে আপনারা ছাড়লেন না। বড়লোক হবার আগে আমার কাকা একজন বড়দরের গুণ্ডা ছিলেন। গ্যাঁড়াতলার গুণ্ডার সর্দার ছিলেন তিনি। সেই সময় পুলিসের অনেক গুলি তাঁকে হজম করতে হয়েছে। পুলিসের হাত ছেড়ে পালাতে গিয়ে কতবার যে তিনি গুলি খেয়েছিলেন তার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁর সারা দেহ অমন অনেক গুলিতে ঝাঁঝরা। বয়স বেশি হয়ে গেলে আর অত ঝক্কি নেওয়া তাঁর পোষাল না। অত ঝক্কি নিয়ে অর্থোপার্জনে শেষ পর্যন্ত মজুরি পোষায় না। তার চেয়ে সোজাসুজি আইনসঙ্গত উপায়ে টাকা কামানোর দিকে তাঁর নজর পড়ল। তিনি বললেন' কেন, আইন বাঁচিয়ে কি চুরি ডাকাতি করা যায় না ? আইনের জোরে কি না হয় ? এবং তারপরই তিনি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার হয়ে গেলেন। তিনি বলতেন, গুণ্ডার সর্দারির চেয়ে কর্পোরেশনের সর্দারিতে বেশি লাভ, অথচ প্রায় একই

ব্যাপার নাকি, একই ওস্তাদির রকমফের কেবল। এমন কি তিনি আরো বলতেন। যে, চোর শুধুই চোর, গাঁটকাটা কেবলই গাঁটকাটা, গুণ্ডা গুণ্ডাই কেবল, কিন্তু এদের সকলের গুণ একত্র করলে, চুরি জোচ্চুরি বাটপাড়ি এবং গুণ্ডামি এক জায়গায় জড়ো করলে যে বস্তু নিজ গরিমায় দেখা দেয় তাই হচ্ছে নাকি কর্পোরেশনের কাউন্সিলার। কর্পোরেশন থেকে লাটের দরবারে এমনকি বড়লাটের খাস কাউন্সিলে যাবার পর্যন্ত তাঁর লোভ হয়েছিল। সে সব জায়গার ব্যাপার নাকি আরো বড়দরের, তিনি বলতেন। কিন্তু সে-বাসনা চরিতার্থ করবার তিনি আর সুযোগ পেলেন না। আমার মুহূর্তের পদস্খলনের জন্যই সে আকাঙ্ক্ষা তাঁর অপূর্ণ থেকে গেল।' কালু সেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল এই বলে'।

"একেই বলে একের পাপে অন্যের পতন।" কান্তি মিত্রের মন্তব্য শোনা যায়।

কালুসেন নীরব। সকলেই চুপচাপ, কারো মুখে কথাটি নেই।

অবশেষে কালুই স্তব্ধতা ভাঙ্‌ল :

"মশাইরা, আমার সময় খুব কম। (আবার এক কাশির ধাক্কা এসে পড়ল।) আমার মনে হয় আমি ভেঙে পড়ছি, ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছি। মৃত্যুমুখেই উপনীত হয়েছি বোধ হয়। থরহরি বাবুর বাড়ীতে মারা পড়ে তাঁকে আবার নতুন আরেক দায়ে জড়াতে আমি চাই না। যেটুকু অল্প এখনো আমার আছে তার মধ্যেই এখান থেকে কোনোরকমে এই মুমূর্ষু দেহকে টেনে হিঁচড়ে আমি চলে যেতে চাই। কিন্তু নির্দোষ এবং কলঙ্ক মুক্ত হয়ে এখান থেকে আমি যেতে পারি কি না সেই কথাই আমি জানতে চাইছি।"

"তুমি নির্দোষ এবং নিরপরাধ।" থরহরি বাবু দাঁড়িয়ে উঠে বললেন।

সতের

॥ কিস্তিমাৎ ॥

কালু সেনের কলঙ্ক মোচনের পর কয়েক দিন কেটেছে। এই ক'দিন ধরে' কান্তি মিত্র কেবলি ভেবেছে কি করবে। মিত্রতার পরিধি আরো বাড়াবে কি না এই ছিল তার প্রশ্ন, অবশেষে আজ সকালে কাঁচির কাপড়ের উপরে সিলকের পাঞ্জাবী চড়িয়ে, সর্বাঙ্গে অগুরু ছড়িয়ে নিয়ে গুরুতর সমস্যাটার মুখোমুখি হবার মতলবেই সে বেরিয়ে পড়ল। সমস্যাটা দেখতে যখন সুশ্রীই, অন্ততঃ আপাত দর্শনে এমন কিছু অরুচিকর নয়, তখন তার সামনা সামনি হতে পেছপা হবার কি আছে? প্রয়োজনই বা কি? এই কথাই কান্তি ভাবল।

এবং এই ভেবেই সে অলকা দত্তর দ্বারদেশে গিয়ে উপস্থিত হোলো কিন্তু তখনো তার ভাবনা তাকে ছাড়ে নি। কড়া নাড়বে কি নাড়বে না? কড়ার আওয়াজ করা উচিত হবে কি? এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে তখনো।

কান্তি মিত্র সিঁড়ির ওপর বসে পড়ল—ভাবতে ভাবতে। এই যে কাজ করতে যাচ্ছি, এর পরিণামে আমার ভাবী জীবন কি সুখময় হবে?' এই কথা সে জিজ্ঞেস করেছে। পুনঃ পুনঃ, নিজেকেই।

'ভেবে দেখলে আমি কৃত্তিবাসের চেয়ে বেশি হঠকারিতা করতে চলেছি। সে নিজের গলায় বিলিয়ার্ডের কিউ বেঁধে ছিল, আর আমি জল জ্যান্ত একটা মানুষকে আমার গলায় বাঁধতে যাচ্ছি? ভালো করছি কি না জানিনে।' কান্তি চিন্তা করে।

আস্ত একটা মানুষকে গললগ্ন করে' সংসার সমুদ্রে সাঁতার দেয়া কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? খোদাই জানেন!' এই কথাও ভেবেছে কান্তি।

না:, আর ভাবব না। কৃত্তিবাস যদি একজনের গলায় ফাঁস

লাগাতে পারে—তা হলে আমি কেন তুজনের গলায় লাগাতে পারব না? সে নিজের গলায় লাগাতে পারল আর আমি পারব না? আমি কি তার চেয়েও ভীতু? তার চেয়ে কি কোনো অংশে কম আমি?'

'না, আমি তেমন কাপুরুষ নই।' অবশেষে এই স্বগতোক্তি করে, কান্তি মিত্র উঠে পড়েছে। সিঁড়ি থেকে উঠে কড়া বাজিয়েছে দরজায়।

দরজা খুলে যেতেই জিজ্ঞেস করেছে: "অলকা দেবী আছেন?"

একটি আধাবয়সী মেয়ে বেরিয়ে এসেছে। অলকা কালকে এখান থেকে চলে গেছে।"

"চলে গেছেন? কোথায়?"

কান্তি মিত্রর মনে হয় আবার সে সিঁড়ির ওপর বসে পড়েছে। নিজেকে ধরাশায়ী বলে' তার—ধারণা হয়।

"তা তো বলতে পারব না।" উত্তর এসেছে মেয়েটির কাছ থেকে।

"আপনি কে? আপনি কি এখানকার—?" কান্তি জিজ্ঞেস করে।

আমরা এই বাড়ীর অন্য ভাড়াটে। অলকার সঙ্গে আমার ভাব ছিল। আপনি কি কান্তি বাবু? সেই রকম যেন মনে হচ্ছে। যদি তাই হয় তাহলে আপনার নামে একটা চিঠি আছে। অলকার চিঠি। দাঁড়ান, এনে দিচ্ছি।"

চিঠিটা নিয়ে কান্তি মনে মনেই পড়ল।

"প্রিয় কান্তি বাবু,

পিলটু আর আমি গতকল্য তিন আইন মতে পরস্পরকে বিবাহ করেছি। পিলটুকে চিনতে পারবেন আশা করি। তাঁর ভালো নাম হচ্ছে কালু সেন। আমরা আজ জাহাজে চড়ে এডেনের দিকে যাত্রা করব। আজ সকালে আমাদের জাহাজ ছাড়চে। এখান থেকে বসোরায় গিয়ে বাসা বাঁধবার বাসনা আছে।

আপনি শুনে সুখী হবেন পিলটুর কাশি এখন অনেকটা কম।

চ্যবনপ্রাশ খাওয়াচ্ছি—কল্পতরুর চ্যবনপ্রাশ। কাশির পেয়ারা খেলেও সারত, কিন্তু তা আর পাচ্ছি কোথায়? তবে বোগদাদের আঙুর খেলে সেরে যাবে আশা হয়।

আরো সুখের বিষয়, কৃত্তিবাস সেনের এটর্ণিরা তাঁর সম্পত্তির উত্তরাধিকার পিলটুকে দিতে ইতস্ততঃ করেন নি। কেন না যে কাগজখানা নিহত কৃত্তিবাস সেনের বুকে আঁটা দেখা গেছল সেটা কৃত্রিম নয়। কৃত্তিবাস বাবুরই নিজের হাতের খসড়া—অনেকদিন আগেকার রচনা। খসড়াটা তাঁর কোন্ দেরাজে ছিল আমি জানতাম! আমিই ওটা বার করে এনে তাঁর জামায় এঁটে দিই—তিনি দেহরক্ষা করবার পর। পিলটুর মুখ চেয়েই এ কাজ করেছিলাম বোধ হয় অন্যায় করিনি।

যাই হোক, ওই খসড়া আমার মামা শ্বশুরের স্বহস্তলিখিত বলে এটর্ণিরা সনাক্ত করেছেন। তা ছাড়া ঐ খসড়ার আরেক কপি' রেজেষ্ট্রিকৃত হয়ে, তাঁদের দপ্তরেও ছিল তাও জানা গেছে।

পিলটু কৃত্তিবাসদত্ত নিজের যাবতীয় স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রি করে বিক্রয়লব্ধ টাকাটা বসোরার ঠিকানায় পাঠাবার ভার এটর্ণিদের দিয়ে যাচ্ছেন। আশা করা যায়, এই কাজের জন্য এটর্ণিরা নিজেদের প্রাপ্য ফিস্ কেটে নিলেও তাঁদের কাছ থেকে ষোলো আনার এক ভাগও, ভাগ্যে থাকলে, কোনো না কোনো সময়ে আমরা পাব। সেই আমাদের যথেষ্ট।

আমাদের দুজনেরই ধারণা, আপনার মত গোয়েন্দা আর হয় না। পিলটু তো বলছে, আপনি থাকলে সে আজ কোথায় দাঁড়াত?

ইতি—আপনার বিশ্বস্ত
অলকা দত্ত।

পুনশ্চঃ—একটা কথা আপনাকে বলতে ভুল হয়েছিল। বিলিয়ার্ড ঘরে যে পিলটুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল সে কথা আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু তা না বললেও এ কথা আমি বারম্বার বলব যে আপনার গোয়েন্দাগিরির তুলনা হয় না।

॥ রহস্যময় অট্টালিকা ॥

প্রথম দর্শনেই বাড়ীটাকে ভালো লাগেনি শিশিরের, কি রকম একটা খটকা লেগেছিল। ওর মন বলছে, উহুঁ এর লক্ষণ তো ভাল না। এখন এর আগাপাশতলা লক্ষ্য করে'—এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে যতটা সুচারু রূপে দেখা সম্ভব—দেখে শুনে ওর সেই সংশয় আরো দৃঢ়ই হোলো।

লিলিকে পাশে ডেকে স্পষ্টই ও জানিয়ে দিয়েছে : 'বাড়ীটার হাবভাব ভালো নয়।'

দাদার কথায় লিলিরও মনে খটকা লেগেছে, বাড়ীটার সম্বন্ধে তত নয়, কথাটার সম্বন্ধেই। দাদার কথাটা কেমন যেন হোলো না? বাড়ীর আবার হাবভাব কী? নির্জীব প্রাণীর কখনো হাবভাব হয় নাকি? হতে পারে কখনো? কথাটার কোথায় যেন ব্যাকরণে বেঁধে গেছে।

লিলিও তার সংশয়টা ব্যক্ত করেছে। 'ঠিকই বলেছি।' শিশির আরো সুদৃঢ় : 'বাড়ীটার গতিবিধি সুবিধে নয়।' 'গতিবিধি?' তুমি কী বলচ দাদা? বার বার কি বলচ? ভারী বাড়াবাড়ি করচ তুমি।' লিলি ফের আপত্তি জানায় : 'বরং বলতে পারো যে গতিক-সতিক।'

'ও একই কথা শিশির বলে : দেখছিস না, কি রকম জরাজীর্ণ এই বাড়ীটা। আমি নখদর্পণে দেখতে পাচ্ছি এর মধ্যে হাজার বছর আগেকার গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে। কতো মণি-মাণিক্য হীরে জহরত কোন এক অন্ধকার কোণে চামচিকেদের সঙ্গে ঠাসাই হয়ে নির্বিবাদে বসবাস করছে। তা না হলে বাড়ীর হাল চাল এমন হয়?

লিলির চোখ বড়ো করে, চেয়ে থাকে কিছু বলে না। বলতে পারে না, হাঁ করে থাকে।

'আমি তাই বলি! কেন যে মামা অমন সাধের দেশঘর ছেড়ে, এতদূরে বিদেশে বর্মা মুলুকে এসে এতদিন ধরে এই বাড়ী কামড়ে পড়ে আছেন, এতক্ষণে বুঝলুম!—'

শিশির আরো কিছুক্ষণ হয়তো গবেষণা চালাত, আরো খানিক তার সন্থ প্রসূত আবিষ্কার, লিলির হাঁর ভেতর দিয়ে চালান দিত, কিন্তু এর মাঝখানে মামার হাঁকডাক এসে বাধা ছায়।

নেপথ্য থেকে উদাত্ত কণ্ঠস্বর ভেসে আসে :

'এই বেলা! বেলা! বেলা না-লিলি—শিশির চা খাবি আয়। এই বেলা আয়।'

চায়ের নাম শুনলে শিশির আর দাড়ায় না, দাড়াতে পারে না। চিরকালই তার এই অক্ষমতা। চার গন্ধ পেলে তো আর কথাই নেই—মাছের চার পাওয়ার মতন আপনা থেকেই সে ধরা দেবে। এমন কি, লিলিও, এখন পর্যন্ত যে দাদার বাক্যে স্তম্ভিত হয়ে দাড়িয়ে ছিল, সেও আর নিজেকে স্তম্ভিত রাখতে পারে না। এক মুহূর্ত দেরী না করে দাদার পিছনে পিছনে দৌড় মারে।

দুমদাম ক'রে তারা ছুটে চলে। টপাটপ সিঁড়ি টপকে হুড়মুড় করে' উঠতে থাকে। কাঠের সিঁড়ি, পুরাণো সাবেক কালের, তাদের পদ ভারে মচ মচ করতে শুরু করে।

সেই মচমচানি ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার কানে গিয়ে পৌছায়। তিনি খচ খচ করতে থাকেন : ঘর দোর সব ভাঙ্গল দেখছি ; সারল দেখছি সব।'

চায়ের পাত্র হাতে আপন মনেই ঝঙ্কার দ্যান। ছুটতে ছুটতে, উঠতে উঠতে, সিঁড়ির মোড় ঘুরবার, রেলিঙয়ের বাঁকের কাছে শিশির ধাক্কা খায়' হোঁচট লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় শিশির। এবং সঙ্গে সঙ্গে তার ধারণা হয়, ধরণী যেন দ্বিধা হয়ে, তার একখানা

পা—যে পা-টা অগ্রণী হয় গেছল, সেই পাখানাকেই হঠাৎ গ্রাস করে ফ্যালে।

শিশিরের মনে হলো, পড়ে যেতেই, তার অধঃপতনের ভারে সিঁড়ির সেই জায়গাটা যেন ফাঁক হয়ে গেল, আর তার গর্তের মধ্যে একখানা পা হঠাৎ সেঁধিয়ে গেল—বেমালুম শূন্যের ভেতর দিয়ে গলে গলে যেমন হয় ঠিক তেমনি আর কি!

বিস্মিত শিশির দু হাতে ভর দিয়ে উঠে পড়ে। উঠে আরো বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে যায়। কোথায় গর্ত, কোথায় কি; তেমনি জমাট সিঁড়ি, কাঠ মিলানো নিটোল দেহ নিয়ে তেমনি জমজমাট! পা ঠুকলে তেমনি খট খট করছে।

য়্যাঁ? এ কি হোলো? এ আবার কি হোলো, অস্ফুট কণ্ঠে বলল শিশির।

কি হোলো দাদা? লিলি পেছন থেকে জিজ্ঞেস করেঃ খুব লাগল নাকি? ও বাবা! এ বাড়ীর আরো গুণ আছে দেখচি।' শিশির জবাব ছায়ঃ 'ভূতুড়ে বাড়ীও বলা যায়।'

'ভূতুড়ে—। ভূতের সাথে লিলি ডরিয়ে ওঠে 'পদচ্যুত হয়ে গিয়েছিলাম আর কি! পা খানা গিলে বসেছিল আমার। বলব কি; এই সিঁড়িখানাই,—বুঝলি লিলি। ভারী আশ্চর্যি।' শিশির বলে, তখনো তার কণ্ঠ বিস্ময়াবিষ্টঃ বাঃ বাঃ পা খানা হাতিয়ে নিয়েছিল আমার আরেকটু হলে।'

'ভূতে? ভূতে নাকি? লিলির নিজের পা কাঁপতে থাকে।

বলব তোকে এক সময়ে। আগে চা জুড়িয়ে গেল চ'!'

ব্রজেশ্বর বাবুর সঙ্গে এই বাড়ীর মিলন আজকের নয়। বছর দশেক আগেকার কথা। এই রাজ যোটকের গোড়ায় একটুখানি ইতিহাস আছে—এবং সেই ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলও খানিকটা জড়ানো।

বছর দশেক আগে ব্রজেশ্বর বাবুর হঠাৎ খেয়াল হোলো, তিনি

পদব্রজে ভূপর্যটন করবেন। যেমনি খেয়াল হওয়া, তেমনি ঘরবাড়ী—সাধের ইস্কুল মাস্টারি সব ফেলে, সমস্ত ছেড়ে-ছুড়ে ব্রজেশ্বর পদ-ব্রজেশ্বর হয়ে বেরিয়ে পড়লেন। আসামের জঙ্গলের ভেতর দিয়ে পাহাড় পর্বত ডিঙিয়ে গিরিবর্ত্ম ভেদ করে, ব্রহ্মপুত্র সাঁতরে, সীমান্ত প্রদেশ পার হয়ে প্রায় প্রাণান্ত অবস্থায় তিনি ব্রহ্মদেশে গিয়ে পড়লেন। পথিমধ্যে কতো য়্যাডভেঞ্চারি যে অবলীলায় অতিক্রম করে গেলেন, সে কহতব্যই নয়। বেশ মজাসেই করে গেলেন।

সব ভূপর্যটকের যা হয়ে থাকে, চলতির পথে যা না ঘটলেই নয়—যে সব দুর্ঘটনার বাধাধরা দস্তুর। ভূ-পর্যটনের ফাঁকে ব্রজেশ্বর বাঘের হাতে পড়েছেন। কিন্তু তাঁর আকার ইঙ্গিতে বাঘ তাকে ভূ-পর্যটক বলে টের পেয়েই, খাবার লালসা পরিত্যাগ করে লজ্জিত হয়ে চলে গেছে। সিংহরা তো ফিরেই তাকায়নি, হায়নারাও হায় হায় ফিরে গেছে। ইয়া ইয়া ভাল্লুক তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে—কিরকম এক সঙ্কোচ; তার একটা কথাও খসাতে হয় নি। এমন কি বড়ো বড়ো সব অজগর, যাদের ল্যাজের মোচড়ে লম্বা চওড়া শাল গাছরাও দেশলাইয়ের কাঠিতে পরিণত হয়—অনিবার্য রূপেই হয়ে যায়—ব্রজেশ্বরকে দেখে, দেখা মাত্রই, ব্রীড়াবনত হয়ে মাথা নীচু করে চলে গেছে।

পাহাড় প্রমাণ হাতীর পাল তাঁকে তাড়া করে' এসেছিল। কিন্তু যেমন এসেছিল তেমনি তারা চলে গেল—বিনা বাক্যব্যয়ে। পরে দেখা গেল তাড়া করে' নয় তাড়া খেয়ে নিজেরাই তাড়িত হয়ে তারা ছুট দিল। এক ঝাঁক বোলতা, কি কারণে তাদের ঝোঁক হলো বলা যায় না, হাতীদের পিছু নিয়েছিল—হাতাহাতি করবার মতলবেই হয়ত, কিন্তু কাপুরুষ হাতীরা পালিয়ে আত্মরক্ষা করেছে। বেশ হাঁক-ডাক ছেড়ে, ল্যাজ তুলে, বীরদর্পেই তারা পালিয়েছে—এমন কি ব্রজেশ্বরকে অগ্রাহ্য করেই। এবং বোলতারাও, ওর প্রতি কোন

বোলচাল ঝাড়েনি, বলাই বাহুল্য। হস্তীমুখের পাশে তাকে দেখা যায়নি বলেই কিনা কে জানে।

এমন কি নরখাদকরাও ওকে মার্জনা করেছিল। যে দিবসে তিনি তাদের পাড়ায় গিয়ে পড়লেন, সেদিন যার ঝলসানো পালা, সে নিজেই ব্রজেশ্বরের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছিল, বলেছিল তার নিজের তুলনায় ব্রজেশ্বর মাংস আরো বড়িয়া হবে, অতএব অত্ত-ভক্ষ ধুন্নগুর্ণ হিসেবে ওকেই আজ টোস্‌ট্‌ করাটা মন্দ কি ; এই বলে সুড়ুৎ করে' জিভের ঝোল টেনে নিয়ে অভ্যাগতের দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। কিন্তু করলে কি হবে ব্রজেশ্বরের স্বাদ না না পেয়েই, একজন আসামজাত বাঙ্গালী আস্বাদ কেমন করে না জেনেই, উচ্চাভিলাষ এ জন্মের মত মুলতুবি রেখে সে বেচারীকে অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই আর সকলের উদরস্থ হতে হয়েছে।

এমন কি, ব্রজেশ্বরেরও।

'প্রস্তাবটায় পালের গোদার তরফ থেকেই বাঁধা পড়েছিল। তিনি বললেন উঁহু ও কাজটিও নয়। ইনি একজন ভূ-পর্যটক। এখন যদি ওকে গিলে ফেলি তাহলে পরে যখন উনি নিজের সভ্য জগতে ফিরে যাবেন, আমাদের সভ্যতার অনেক নিন্দাবাদ রটাবেন—অনেক গালমন্দ দেবেন নিঃসন্দেহ।' তাই ওকে হজম করা সমীচীন হবে না।

অতএব ব্রজেশ্বরকে ওরা ভালো করে খাইয়ে দাইয়ে সেই প্রতিবাদকারীকেই ওঁর পাতে পরিবেশন করে (যদিও সামান্য ভগ্নাংশে) পরিতুষ্ট করে ওকে ছেড়ে দিয়েছে।

ব্রজেশ্বরও নিমক হারাম নন। তিনিও সভ্যজগতে ফিরে এসে, এ সম্বন্ধে কাউকে কিছু বলেন নি। নিন্দাবাদ দূরে থাক—কোনো উচ্চবাচ্যই করেন নি। একবার যাকে, যাদের একজনকে গালে তুলেছেন তাদেরকে তিনি গাল দেবেন কোন্ মুখে ?

তবে মাঝে মাঝে তাঁর মনে হয়েছে এই যে, দাঙ্গা ফ্যাসাদে

এত এত লোক ক্ষয় হয়, নাহক এত মানুষ মারা পড়ে, এদের যদি মনে হাঙ্গামা-টাঙ্গামা চুকে গেলে রেধে বেড়ে সাবড়ে দেবার কোনো উপায় থাকত তাহলে হয়তো নেহাত মন্দ হোতো না। সমস্ত ব্যাপারটা তা হলে একটা অর্থ হোতো, সর্বদাই হোতো না, মাংস পাতে সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এখন যা হচ্ছে এযে একেবারেই অকেজো, বাজে খরচ, সমস্তটাই বরবাদ; এর কি কোন মানে হয়? অনর্থক বৃথা অপচয় বইতো নয়? ব্রজেশ্বরের সভ্যতার চেয়ে ওদের সভ্যতা অনেক বেশী উপাদেয়, ঢের সুস্বাদু—এই কথাই ওর মনে হয়েছে। মনে হয়েছে আর উনি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলেছেন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলছন আর নিজের জিভ চেটেছেন। তবে কেবল মাঝে মাঝেই—এই যা; সেই নরখাদকের তবে তিনি ভুলতে পারেন নি। তার কথা চিরদিনের জন্তে তাঁর স্মৃতিপটে খোদাই হয়ে গেছে।

পথভ্রষ্ট এইসব উপদ্রব উৎপাত অনায়াসেই তিনি এড়াতে পেরেছিলেন, এসব তো ঘটবেই এবং কেটেও যাবে, কেটে-কুটে না গেলেই হলো। এবং ঠিক যেমন যেমনটি ঘটে থাকে, সাধারণতঃ সব পরিব্রাজকের ডায়েরিতেই দেখা যায়, তার কিছুতেই—কোনোখানেই তার ব্যত্যয় ঘটেনি। একটুও না। সবই তিনি পেয়েছিলেন এবং পেরিয়েছিলেন—অবলীলাক্রমেই কেবল এক ডাকাতরাই তাকে ছেড়ে কথা বলেনি।

তারা বলেছে, বাপু, তুমি একটি ভূ-পর্যটক। বলতে হবে না, না দেখেই টের পেয়েছি। তা' বাপু তুমি যেখানেই যাবে বক্তৃতা ঝাড়বে, অটোগ্রাফ ছাড়বে, আর টাকা মারবে। তোমার এত টাকা খাবে কে? আমরা তোমাকে প্রাণে মারতে চাইনে, কেন না তোমাদের মারলে আমাদের লোকসান। তোমরাই আমাদের বন্ধু হিতৈষী উপকারক—রোজগারের উপায়—তোমরা মলে টাকার থলে নিয়ে এত জায়গা থাকতে বেছে বেছে এইসব বিপদজ্জনক পথে ভূ-পর্যটক করবে কারা? তোমাদের খতম করলেই আমাদের

ক্ষতি। তোমাদেরও দফারফা আর সেই সঙ্গে আমাদেরও ব্যবসা মাটি। না বাপু, সেটি হচ্ছে না। তোমাকে মেরে ফেলব এ যদি ভেবে থাকো তাহলে ভুল করেছ।

যেমন প্রাণ হাতে নিয়ে বেরিয়েছ, তেমনি প্রাণ হাতে করে ফিরে যাও। সম্মিলিত এক যৌথ কারবারের যেটা আমাদের লভ্যাংশ, আমাদের ভাগের লাভ, সেইটা আগে ফ্যালো দিকি। তার জন্যেই তো এত কষ্ট, মাটি গেড়ে মশার কামড় খেয়ে এই জঙ্গলের মধ্যে ওত পেতে বসে থাকা—কবে কালেভদ্রে তোমাদের এক আধজন ছিটকে ছাটকে এই পথে ভুলে এসে পড়বে। সুবোধ বালকের মতই এসে যাবে। তা নইলে আর কেন শিকারের আশায় এতখানি ত্যাগ স্বীকার? বল তুমিই বল।

ব্রজেশ্বর? ব্রজেশ্বর আর কী বলবে। মুখটি বুজে ওর পুঁজিপাটা যা কিছু ছিল, যা নিয়ে বেরিয়েছিল সবই সেই বন-দস্যুদের হাতে গুঁজে দিয়েছে।

এত ফাড়া কাঁটিয়ে এসে অবশেষে ডাকাতের পাল্লায় পড়ে ব্রজেশ্বরকে পথচারী পদ-ব্রজেশ্বরকে সর্বস্বান্ত হয়ে পথেই বসতে হয়েছে।

লিলি হাঁ করে মামার ভোজন বিলাসিতা দেখছিল। প্রাতরাশে বসে বারোখানা টোসট গোগ্রাসে উড়িয়ে দেওয়া সহজ কথা নয় এবং এও মামার প্রথম কিস্তি না। খুব ভোরে যখন উনি ষ্টেশন থেকে ওদের আনতে গেছলেন, সেই সময়ে রেলওয়ে কেবিনে, একসঙ্গে জড়ো হয়ে আলি টীর মারফত ইতিমধ্যেই ওঁর এক প্রস্থ হয়ে গেছল—তারপরে এই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে, নিজের বাড়ীতে বসে বিশেষ তোড়জোড়ের সঙ্গে তার এই দু-নম্বর ব্রেক ফাস্ট।

লিলি হাঁ করে মামার খাবার বাহাদুরি দেখছিল আর মাঝে মাঝে এক ফাঁকে নিজের হাঁ-এর মধ্যে বিস্কুটের টুকরো ভেঙ্গে

ভেঙ্গে রপ্তানি করছিল, এমন সময়ে শিশির একটা অদ্ভুত প্রশ্ন করে উঠল।

শিশির এতক্ষণ নিজের মনে কী যেন ভাবছিল, কোনদিকে তাকায় নি, একটিও কথা বলেনি। যত রাজ্যের ভাবনা চায়ের সঙ্গে মিশিয়ে গরম চা খাচ্ছিল যেন। হঠাৎ যেন চা চলকে, চায়ের পাত্রে তুফান তুলে, একটা প্রশ্নের ঢেউ মাঝখান থেকে তার মর্মস্থল ভেদ করে উঠল।

আচ্ছা মামা তুমি কোনো নকশা পাওনি? জিজ্ঞেস করল শিশির।

নকশা? কিসের নকশা?

এই বাড়ীর কোনো চোরা কুঠরীর? যেখানে গুপ্ত ধনভাণ্ডার লুকানো রয়েছে?

এই বাড়ীতে চোরা কুঠরী আছে কে বললে তোকে? তুই কি করে জানলি যে এখানে ধনভাণ্ডার লুকানো আছে?

ব্রজেশ্বর সন্দিগ্ধ নেত্রে তাকান।

এই আন্দাজ করছি। এরকম থাকে কিনা; শিশির কৈফিয়ৎ ছায়ঃ য়্যাডভেঞ্চারের বইয়ে কতই তো এমন পড়া যায়।

উঁহু বইয়ে পড়ার কথা নয়। মামা খুঁত খুঁত করেন, তবু খুব খারাপ কথা ভারী ভীষণ কথা এসব।

তুমি তাহলে কোনো নকশা পাওনি? তাই বলো।

কেন, তুই পেয়েছিস নাকি? ব্রজেশ্বর শাণিত চোখে শিশিরকে বিদ্ধ করতে থাকেন।

এখনো পাইনি, তবে পাব পাব মনে হচ্ছে। শিশিরের হাসি রহস্যময়।

'ওঃ এখনো পাসনি। পাব পাব মনে হচ্ছে। তবু ভালো! তবু রক্ষে।' ব্রজেশ্বর এতক্ষণে রুদ্ধ নিশ্বাসকে মুক্ত করে' দিয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন : 'আরে আমি তো বারো বছর ধরেই পাব পাব মনে করছি; মনে করার আর পাওয়ার ঢের দূর—ঢের ফারাক। হুঃ!'

শিশির কোন জবাব দেয় না, আপন মনে কী যেন ভাবে আর প্যাঁচ কষে।

লিলি বলে : মামা, ও কথা থাক! আসামের জঙ্গলে তারপর কী হোলো বলো। ষ্টেশন থেকে আসতে আসতে যতখানি বলেছ তার পর থেকে শুরু করো—

কদ্দূর বলেছি? পথে ডাকাতের পাল্লায় পড়েছিলাম সেই পর্যন্ত না? আচ্ছা, তারপর থেকে বলি শোন।' ব্রজেশ্বর পুনরায় নিজের পর্যটন কাহিনী শুরু করেন, নিজের মনে আর নিজের ভ্রমণে মশগুল হয়ে যান।

সেই ডাকাতরা তো? বেজায় বজ্জাত! ভারী ফিচেল আর ভয়ানক নাছোড়-বান্দা। আমি যতই বোঝাই, যতই আপত্তি করি কিছুতেই কান ভায় না। যতই বলি যে বনের পশুরাও ভূ-পর্যটন বলে' খাতির করে আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, নরখাদকরাও আমাকে পথ ছেড়ে দিয়েছে, ভালো মানুষ হয়ে, তোমাদের এ কি কাণ্ড? এ কি রকম অভদ্র ব্যাভার? ততই ওরা বলে আমরা তো আর চার পেয়ে জন্তু নই যে, পেয়ে তোমাকে অমনি ছেড়ে দেব। ওসব কথায় আমরা কর্ণপাত করিনা। আর নরখাদকদের কথা তুলছ যে, তোমাকে হজম করে'—সাবড়ে দিয়ে কী লাভ? খেতে আর এমন কি তুমি খাসা হবে, তোমাকে খেয়ে ছেড়ে দেব—এই যদি তুমি ভেবে থাকো হুঃ! আমরা অতো বোকা নই। আর—তুমি তো একটা অখাদ্য!'

আমি একটা অখাদ্য ? শুনে আমার মনে দুঃখ হলো। তুমি আসামের ডাকাত—ডাকাতির আসামী—অধম পাপী, তুমি কি বুঝবে ? তোমাদের এলাকায় একলা পেয়ে, অসহায় পেয়ে অখাদ্য বলে' আমাকে খুব কসে' অপমান করে নিচ্ছ। নাও, নাও, নিয়ে নাও, কী আর করছি; কিন্তু সে—সেই সামান্য নরখাদক —সেও তোমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। হ্যাঁ, বহুগুণে উত্তম, আমি মুক্ত কণ্ঠে বলব—আমি নিজেই ভালো করে চেখে দেখছি। আমি কতখানি সুখাদ্য—কতটা সুস্বাদু, সে কিন্তু তোমাকে না চেখেই বুঝেছিল—দেখেই বুঝতে পেরেছিল। প্রথম দর্শনেই প্রলুব্ধ হয়ে সে আমাকে তার অন্তরঙ্গ করতে চেয়েছিল!

তার কথা ভেবে আমার দীর্ঘ নিশ্বাস পড়ে যায়। জিভ দিয়ে একটু জলও যে না পড়ে তাও নয়। প্রথমে তার ওপরে আমার রাগ হলেও, সত্যি প্রথমে তাকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি—অতটা সমঝদার বলে ভাবতে পারিনি, একটু ভুলই বুঝেছিলাম তাকে। আমাকে উদরস্ত করার তার উৎসাহটা আমি খুব ভালো চোখে নিতে পারিনি—গোড়ায়, কিন্তু বেশীক্ষণ সে রাগ আমার ছিল না। তাকে মুখস্থ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার রাগ পড়ে গেছল—তাকে আত্মসাৎ করবার পরে আমার যা কিছু রাগ, জিভের জলের সঙ্গে এক হয়ে একাকার হয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। তারপর তাকে অন্তর্গত করবার পর থেকে, আমার অন্তরের সমস্ত অনুরাগ এখন তার উপর গিয়ে চড়াও হয়ে পড়েছে। সে আর আমি এখন অভিন্নাত্মা, একথা বললেও অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু একজন সামান্য ডাকাত, যার কেবল মাত্র পর ধনে লোভ—পরস্মৈপদী সম্পত্তির লালসা—মানুষের মূল্য যথার্থ মূল্য সে কী বুঝবে ? তার সাধ্য কি ? একটা খুন হলেও বরং বুঝতে পারত। চোর ডাকাতের কর্ম না। হ্যাঁ ডাকাতের আবার খাদ্যা খাদ্য-বোধ।

যাগ গে, যেতে দাও, পৃথিবীতে সবাই কিন্তু সব জিনিষের

সমঝদার হয় না। 'ভিন্ন রুচি' ব'লেই দিয়েছে। সবার রুচি কিছু সমান হয়। অধম কি উত্তম হবে? ধমাধম উত্তম-মধ্যম দিলেও না। আর কথা বেশী না বাড়িয়ে, আমার যথা-সর্বস্ব যা ছিল সব সেই ডাকাতের হাতে সপে দিয়ে কেবল মাত্র কালাজ্বর সম্বল করে কাঁপতে কাঁপতে অবশেষে বর্মায় এসে পৌঁছলাম।

জ্বর গায়ে জর্জের অবস্থায় একজন ব্রহ্মদেশীয়ের বাড়ী—অতিথি হলাম। লোকটি ভারী ভালো। না, না, সেরকম ভালো নয় —সেই নরখাদকের মত ভালো সে কথা বলছি না। সে রকম ভালো কি জানব কি করে? সবাই কি আর গায়ে পড়ে নিজেদের চাখতে দিচ্ছে? আর চাখতে দিলেও, সে—লোকটি যে রকম বুড়ো আর জরাজীর্ণ—তাতে সেই নরখাদকের মতো ভালো হবার তার সম্ভাবনা কম ছিল। সে রকম কচি নর খাদ্য খুব ক্কচিৎ মেলে।

তবু লোকটি ভালো। কেননা, আমি লোকটা ভালো কিনা তার বাড়ীতে পেয়েও—হাতে নাতে পেয়েও—জানবার চেষ্টা মাত্রও সে করেনি। করলে, সেই কাহিল অবস্থায়, আমি তাকে আট-কাতে পারতাম কিনা সন্দেহ। বিনা বাক্যব্যয়ে অক্লেশে তার উদারসাৎ হয়ে যেতাম।

যা হোক, দিন কয়েক জ্বর জড়িত থেকে কোনো গতিকে সেরে তো উঠলাম—আর সে লোকটি সেই বুড়ো গৃহস্বামীটি—

ব্রজেশ্বরবাবু বলতে বলতে থেমে গেলেন। লিলি বলে উঠল: কি হলো তার? কি হোলো মামা?

কি আবার হবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা।

কবিতা। সে আবার কি? শিশির জিজ্ঞেস করে। রবীন্দ্র-নাথের কবিতায় তাকে ধরল। সেই লোকটা নিজেই শেষে রবীন্দ্র-নাথের একখানা কবিতা হয়ে বসল। রবীন্দ্রনাথের কবিতা হয়ে গেল সেই লোকটা? য়্যাঁ? শিশির লিলি ভয়ানক ধাঁধাঁয়

পড়ে যায়। সে আবার কি? আমি সেরে উঠতে না উঠতে, বুঝলি কিনা,—ব্রজেশ্বরবাবু এবার ষ্টীক ব্যাখ্যা করে সমস্তটা জলবত্তরল করে ছ্যান: নিল সে আমার কালব্যাধিভার আপনার দেহ' পরে।

ও: তাই বলো। তাকেও কালা জ্বরে ধরবে! শিশির হাঁপ ছাড়ে। লিলিও হাঁপ ছেড়ে বাঁচে।

আর তুমি—তুমি বুঝি তাকে—লিলি সভয়ে দুচোখ বড়ো করে তাকায়, ওর বেশী ও এগুতে পারে না।

দূর দূর। আমি কি আর তাই করি। লোকটার প্রতি তো আমার একটু ভালোবাসা হয়নি যে—তবে—তবে কেন? ব্রজেশ্বরবাবু জবাবদিহি ছ্যান: লোকটার ওপর আমার কেমন একটা বৈরাগ্য ধরেছিল।

তাই বোধহয় ও বেঁচে গেল? শিশির বলে। টিঁকে গেল এ যাত্রা?

ওঁহু বাঁচল না। মারাই পড়ল শেষটায়। মরবার সময় বলে গেল, মৌলমীনে তার একটা বাড়ী আছে, আর সেই বাড়ীটার মধ্যে একটা চোর কুঠরী রয়েছে, আর সেই চোর কুঠরীর মধ্যে—

অগাধ ধনরত্ন। শিশির নিশ্বাস ছাড়ে।

তুই কি করে জানলি? ব্রজেশ্বরবাবু রুখে ওঠেন: কে বলে তোকে? বলতে হয়না। এমনিতেই জানা যায়। অনেক য়্যাডভেঞ্চার বইয়ে পড়া গেছে। এরকম ঢের পড়েছি আমি।

কই সে বই? সে সব বই কই দেখি?

সঙ্গে আনিনি তো। শিশির জবাব ছ্যায়।

মাথা কিনেচ আমার; মামা আরো ক্ষেপে যান: একটা যদি উপকার হয় কারুর দ্বারা। কথায় বলে যম জামাই ভাগনে, তিন না হয় আপনে! এই তিন মূর্তি কক্ষনো আপনার হয় না। কথাটা দেখছি ঠিক।

বাঃ আমি কি করে' জানব যে সে বই তোমার কাজে লাগবে? শিশিরও একটু খাপ্পা হয়ঃ তুমি কি আনতে বলেছিলে?

না বললে কি আনতে নেই। ভাগনে তবে আর বলেছে কেন?

লিলি মাঝখানে পড়ে ঝগড়া মিটিয়ে দেয়ঃ আচ্ছা, আমি মাকে লিখে দেব'খন? মা ভি-পি করে' পাঠিয়ে দেবে।

মামা এতক্ষণে একটু আশ্বস্ত হনঃ হ্যাঁ, লিখে দিস যেন ফেরৎ ডাকেই পাঠায় যেন। এমন জরুরী দরকার যে কী বলব। যদি সেই সব বইয়ের ভেতরে কোনো রকম ফন্দি ফিকির বাতালানো থাকে" হদিশ টদিশ থেকে যায় কোনো। হ্যাঁ তারপর কি বলছিলাম। সেই বর্মী বুড়োটা! মরবার সময় মৌলমীনের সেই বাড়ীটা আমাকে দিয়ে গেল। আর বলে দিয়ে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তুমি কখনো সে বাড়ীতে থেকো না।

বুড়ো বললোঃ কেন, বুঝতে পাচ্ছ না? কোথায় আমি এই উত্তর ব্রহ্মে, আর কোথায় সেই সুদূর দক্ষিণে সমুদ্রের ধারে মৌলমীন। মৌলমীন শহর ছেড়ে, সেই রাজার অট্টালিকা পরিত্যাগ করে' কেন এখানে এসে, এই হিমালয়ের পাদদেশে এমন কষ্টে-সৃষ্টে বসবাস করছি। তাই থেকেই কি বুঝতে পারছ না?

আমি বললুমঃ উহু। কি স সু না।

বুড়ো বললেঃ সে বাড়ী; ভারী ভয়ানক আর তার পরেই সে খাবি খেতে শুরু করল।

আমি ব্যতিব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলুমঃ তা তোমার সেই চোর কুঠরীর সন্ধান পাব কি করে? তার কি কোনো নকশা টকশা নেই? আছে? কোথায় সেই নকশা? বলো বলো, 'বলে যাও। অমন করে' খাবি খেয়ো না। ঐ ভাবে চলে' যেয়ো না; ছলনা করে' চলে যেয়ো না। আমি বারম্বার আবেদন করি—সকাতর প্রার্থনা করি—তার অন্তিম দরবারে আমার ব্যাকুল আজ্জি জানাই, সে ঘাড় নাড়ে, তার ঠোঁট নড়তে থাকে। কিন্তু

তার বেশী আর কিছুই তার সে হাঁ-করা মুখ দিয়ে বার হয় না—হাঁ-ওনা—হুওনা।

শিশির বলল এমনই হয়; ঠিক এই রকমটাই হয়ে থাকে—কি বলিস লিলি? ঠিক এই ধরনটাই হয় কিনা?

হ্যাঁ দাদা লিলি তার ছোট ঘাড়খানা নেড়ে সায় ছায়। সব বইয়ের ঠিক এই রকম।

তবে আমি জানি, আমি জানি বটে, কোথায় তোমার সেই নকশা আছে। শিশির ব্রজেশ্বরবাবুর দুঃখ দূর করবার চেষ্টা করে: বুড়ো না বললেও আমি তোমায় বলে দিতে পারি। বলে দেয়া কেন, আমি বার করেই দিচ্ছি যা হয়! এসো আমার সঙ্গে এখনই বার করে দিচ্ছি।

॥ কেঁচো খুঁড়তে সাপ ॥

শিশর যায় আগে আগে, সাথে সাথে লিলি। পেছনে পেছনে ব্রজেশ্বরের মুখে অবিশ্বাসের হাসি।

আশ্চর্য নয়। দীর্ঘ বারো বছরের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না হলে বড় বড় বিশ্বাসই টলে যায়। বারো বছর ধরে চেষ্টা চরিত্র করে', বাড়াবাড়ি করেও এমন কি, ভগবানের যদি দেখা না মেলে—তার টিকিরও সন্ধান না পাওয়া যায় তা হলে বড় বড় বিরাট বিরাট, ভক্তও নাস্তিক্যবাদী হয়ে পড়ে। অগাধ ধনরত্ন তো তুচ্ছ, ব্রজেশ্বর তো কোন ছার। শিশির জিজ্ঞেস করে: নকশাটা কোথায় রয়েছে, টের পেয়েছিস লিলি?

না তো। লিলি ঘাড় নাড়ে।

এই বই পড়া তোর ব্যর্থ হয়েছে দেখছি। বাজেই য়্যাদ্দিন য়্যাডভেঞ্চারের বই তোকে পড়ালুম। কিছু লেখাপড়া হয়নি তোর।

এখনো মানুষ হতে পারিস নি। শিশির মুখখানা মুরুব্বির মতো জানায়ঃ মেয়েই রয়ে গেছিস। আস্ত একটা মেয়ে।"

কথাগুলো ঠিক মোরব্বার মতো নয়, লিলি মুখ কাচু মাচু করে থাকে। প্রতিবাদের চেষ্টা করেঃ বারে, আমি কি করে জানব। আমি কি হাত গুণতে জানি?

আমার যদি একটা টাইগার থাকতো সেও যে দিতে পারত রে। শিশিরের অসন্তোষ সীমা ছাড়িয়ে যায়।

আমার থাকলে সেও বলতে পারত। লিলিরও এবার একটু ধোয়া বেরয়ঃ টাইগাররাই তো পারে। ওদেরই তো এই কাজ। ওরাই পারবে তো। ও তো মানুষের কর্ম নয়। কিন্তু—কিন্তু তার আশঙ্কাটা ব্যক্ত করা যুক্তি যুক্ত হবে কিনা ভেবে লিলি একটু ইতস্ততঃ করেঃ কিন্তু টাইগার আর আমি পাচ্ছি কোথায়? তুমি তো আর টাইগার হতে পারবে না। অন্ততঃ এজন্মে তো আর পারছ না।

এজন্মেই পারব। পারব না, কে বলেছে কে? শিশির গরম হয়ে ওঠে। অনেকেই বলে। তা বলে আর পারতে হয় না? লিলিও টগবগ করতে থাকেঃ ঘেউ ঘেউ করা সহজ, টাইগার হওয়া অত সহজ নয়। এক্ষুণি পারব। চক্ষের পলকে দেখিয়ে দিচ্ছি শিশির সুদৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা করেঃ দেখতে না দেখতেই দেখতে পাবি।

এই বলে, শিশির, সিঁড়ির সেই জায়গাটায় গিয়ে দাঁড়ায়, সেইখানে, যেখানে সে হোঁচট খেয়ে পড়েছিল একটু আগেই।

শিশির জায়গাটার আশপাশ তলা পা চালিয়ে, টিপে টিপে ছাখে। কিছু না। তারপর সহসা উচ্ছৃঙ্খল হয়ে, একজন উঁচু দরের নাচিয়ের মত দাপাদাপি লাগিয়ে দ্যায় দেখতে না দেখতেই আবার ধরণী দ্বিধান্বিত হয়েছে, এবং সেই দ্বিধার অবকাশে, সেই ফাঁকের ভেতর দিয়ে, শিশিরের একখানা শ্রীচরণ গলে চলে গেছে।

এই যে। এই যে পেয়েছি! পেয়ে গেছি! কেল্লা মেরে দিয়েছি। শিশির চিৎকার করে ওঠে।

ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসে আর সন্দেহে, বিস্ময়ে আর বিরক্তিতে এতক্ষণ ওতোপ্রোত হচ্ছিলেন, এবার তিনিও আর্তনাদ করে উঠলেন।

ভাঙলি! ভাঙলি তো সিঁড়িটা। আমি তখনই জানি! এই তোমার নকশা বার করা?

কিন্তু বলতে না বলতে, শিশির, পায়ের সঙ্গে একখানা হাত গলিয়ে দিয়েছে, এবং হাতড়ে-মাতড়ে, তার অন্তঃস্থল থেকে, রুলের মতো করে পাকানো কাগজের কী একটা গুলতানি টেনেও বার করেছে।

কাগজটার ভাঁজ খুলে ফেলতেই—বেরিয়ে পড়ল পুরানো এক পার্চমেণ্ট আর তার পিঠে কী সব মক্স করা।

এই তো সেই নকশা। শিশির উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল: সেই নকশাই তো!

শিশিরের মামা সিঁড়ির মাথায় বিমূঢ়ের মত দাঁড়িয়ে এতক্ষণ কী যেন একটা স্বপ্ন দেখছিলেন, এইবার তিনি এক লাফে একটি মাত্র উল্লম্ফনে সব কটা সিঁড়ি এক নিমেষে টপকে এসে শিশিরের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

দে—দে! আমার নকশা দে। বলতে না বলতে পার্চমেণ্টটা তিনি শিশিরের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন।

বাঃ আবিষ্কার করলাম, আর তোমার নকশা কি রকম? শিশির ঈষৎ প্রতিবাদের সুরে বলতে গেছে।

তোর নকশা। ভারী ইয়ার হয়েছেন। এই বলে ব্রজেশ্বরবাবু ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দিয়েছেন শিশিরের গালে: বারো বছর ধরে আমি ব্যাটা হাতড়ে মরছি, আর কিনা নকশা হলো তোর। আবদার আর কি!

এই বলে তিনি আর অযথা বাক্যব্যয় না করে অতিরিক্ত চড়-চাপড়ের প্রলোভন পর্যন্ত সম্বরণ করে দৌড়তে দৌড়তে নিজের ঘরে গিয়ে সশব্দে খিল এঁটে দিয়ে নকশার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন।

খুব লেগেছে নাকি দাদা? লিলির আবার শিশিরের প্রতি সহানুভূতি দেখা যায়।

শিশির কিছু না বলে আহত গালে হাত বুলোয়।

এ কি রকম মামা আমাদের? লিলি অবাক হয়। বাবাঃ, কী বদরাগী! মামারা এইরকমই। শিশিরের আপন মনে সান্ত্বনা লাভের প্রয়াস।

আচ্ছা, মামা হঠাৎ এমন ক্ষেপে গেল কেন রে দাদা? লিলির দাদার গালে হাত বুলোতে পারে না, ইচ্ছা থাকলেও পেরে ওঠে না, একটু আগেই ওদের মধ্যে যে বাক্‌যুদ্ধ হয়ে গেছে সে কথা মনে করেই ওর হাত ওঠে না।

ভয় করে, তাহলে হয়ত শিশিরের হাত উঠে আসবে। নিজের গাল থেকে লিলির গালেই এসে পড়তে পারে চাই কি।

অর্থমনর্থম্ ভাবয় নিত্যম্। শিশির উদাসীনের মত জবাব দ্যায়। তার মুখপত্রে দার্শনিকতার বিজ্ঞাপন।

এ রকম হবে আমি ভাবতেও পারিনি। লিলির কণ্ঠে সহানুভূতি সুর।

আমি ভাবতে পেরেছিলাম। শিশিরের গলায় নিলিপ্তির স্বর। এই রকমটাই হয়। এই রকমটাই হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই আমি এসব ভেবে দেখেছি। শিশিরের ললাটে ভূয়োদর্শনের প্রচ্ছদপট।

থাক গে। যেতে দে। মামা তো খিল এঁটেছে। চোরকুঠরীর হদিস না নিয়ে আর নড়ছেন না। চল এই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ি, মৌলমীন শহরটা বেড়িয়ে চড়িয়ে দেখে নিই ততক্ষণ।

বেড়াতে বেড়াতে তুজনে সমুদ্রের ধারে চলে যায়। শিশির ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলে : মামা কি রকম চালাক দেখলি ? দেখলি তো লিলি ?

মামার মূঢ়তা দেখেছে, রূঢ়তাও দেখা গেছে, মামা যে' লাকী, সে বিষয়েও ভুল নেই, অযাচিত অপ্রত্যাশিতভাবে বাড়ীর নষ্ট-কোষ্ঠী পুনরুদ্ধারেই সেটা প্রত্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু মামার চালাকি যে কোনখানে লিলি সেটা সহজে বুঝে উঠতে পারে না।

আমাদের শিলং থেকে, অতো লং ডিস্ট্যান্স থেকে ধরে বেঁধে ডেকে আনানোর কী মানে, বুঝতে পারলি নে ?

না তো!

এ জন্যেই। চালাকি করে নকশাটা উদ্ধার করে নেবার জন্যেই। আমাকে ছাড়া আর কারু দ্বারা হোতো না কি না। শিশির তুঃখের সহিত এবং একটু গর্বের সঙ্গেই বিবৃতি দ্যায়। এছাড়া তাদের আনানোর আর কী কারণ থাকতে পারে, শিশির ধারণা করতে পারে না। কোথায় শিলং আর কোথায় মৌলমীন—কতখানি ফারাক। এবং যে মামা বারো বছর আগে তাদের মায়া কাটিয়ে চলে এসেছেন, সে সময়ে তারা তু'তিন বছরের, সেই সময়েই যা কোলেপিঠে করে মানুষ করে—বা মানুষ করবার বৃথা চেষ্টা করে অবশেষে (তুশ্চেষ্টায় হতাশ হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েই কিনা কে জানে) তাদের পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন, এমনও হতে পারে যে তারাই মামার বৈরাগ্যের কারণ,—মামার আকস্মিক বাণপ্রস্থের, পরদেশে আসক্তির, দেশান্তর-বিলাসিতার মূলে খুব সম্ভব তারাই; মামা হয়তো ভেবেছিলেন, এই শিশুদের, যারা কখন নায়গ্রা আর কখনও গন্ধমাদন তার কিছুই স্থিরতা নেই—কখন প্রপাত আর কখন বা উৎপাৎ বলা কঠিন, কখন যে খাদ্য (কেবল চুমুর দিক দিয়ে) আর কখন অখাদ্য কে বলবে, তখন যাবতীয় লাভ ক্ষতি খতিয়ে তিনি ভেবে দেখলেন, এদের কোলে পিঠে করার চেয়ে সমস্ত

ভূভার ধারণ করাও সহজ, (এবং ঢের বেশী নিরাপদ) এর চেয়ে, এই পরস্মৈপদী নন্দন-কানন বহনের চেয়ে, কস্তরী মৃগসম নিজের গন্ধে উন্মাদ হয়ে, বনে বনে, অরণ্যে অরণ্যে, সারা ধরিত্রীময় ছুটোছুটি করে বেড়ানোও ঢের ভালো—ঢের ঢের সুখের। সেই বিরাগী মামার হঠাৎ যে আবার এত অনুরাগ উথলে উঠবে এমন মন—কেমন করতে লাগবে যে, তাদের দেখবার লালসায়, মার কাছে তার করে সামার ভ্যাকেসনেই আমদানী করার জন্যে তিনি ব্যতি-ব্যস্ত হয়ে পড়বেন, এরকম সম্ভাবনার ভাবনাই করা যায় না। শিশির, ব্রজেশ্বরবাবুর মতলবটা মনোগত অভিপ্রায়টা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে চুল চিরে লিলির কাছে পরিষ্কার করে ছায়। সমুদয় রহস্য সূর্যোদয় কুয়াসার মতো বেবাক ফাঁক হয়ে যায়। তাই তো! তাই তো বটে। লিলিও আর ভিন্নমত পোষণ করতে পারে না। আমি অবশ্যি প্রথমে অন্য কথা ভেবেছিলাম—বলতে চেপে যায় শিশির।

কি? কি কথা?

না, বলব না। বললে তুই ভয় খাবি। শিশির বলে। না, বলো না?

ভয় কিসের? লিলি রীতিমত নির্ভীক।

আমি ভেবেছিলাম—মামার গল্প শুনতে শুনতেই মনে হয়েছিল আমার। মামা সেই যখন বলল না যে, সেই নরখাদকটার তার এখনো তার মুখে লেগে রয়েছে—বলল না?

বলল তো; আর কি?

সেই ভুক্ত ভোগী নরখাদকটা মামার পেটে গিয়ে যে এখন বসবাস করছে।

করছেই তো! কি হয়েছে তার?

সে আর এখনো আছে কি? কবে হয়ে গেছে। তাই মামা হয়তো আর শুন্য স্থান পূরণ করবার জন্যে তার অভাব মোচনের অভিলাষেই, হয়তো—হয়তো—হয়তো আমাদের—?

য়্যা? লিলির দু চোখ ভয়ে যেন ভুরুর পাঁচিল ডিঙ্গিয়ে লাফিয়ে পড়তে চায়।

হ্যাঁ তাই। মামা বলল কি না যে লোকটার তার এখনো তাঁর মুখে লেগে রয়েছে। বলেই সুড়ুৎ করে মুখের ঝোল টেনে নিল, আর জিভ দিয়ে ঠোঁটটা চেটে নিল—দেখলি না?

আর কেমন একটা অদ্ভুত চোখে আমাদের দিকে তাকালো, লিলি কম্পিত স্বরে বলেঃ দেখেছি বইকি।

তবু তো সে লোকটা খাসীই ছিল; ধেড়ে একটা খাসী ছাড়া আর কি? আমাদের মতো কচি পাঁঠা পেলে—?

বাকীটা, বাকী অনির্বচনীয়ত্ব, শিশির অব্যক্ত্যই রেখে ছায়।

তাহলে চলো পালাই এখান থেকে। পরের ট্রেনেই পালিয়ে যাই। সোজা একেবারে রেঙ্গুনে—সেখানে থেকে ফিরতি জাহাজে লম্বা এক পাড়ি। লিলি লীলায়িত হয়।

উঁহু যখন এসেছি তখন পর্যন্ত না দেখেই যাবে?

গুপ্তধনের কিনারা না করেই? পাগল? তাছাড়া, খেলেই অমনি হোলো কিনা! খাওয়া পথেই পড়ে আছে আর কি? হুঁ। আমরা হুঁশিয়ার থাকব না? তা ছাড়া, আরেকটা কথা—।

কি? কি কথা? আরে কি আশ্চর্য কথা শিশিরের আশ্চর্যতর মাথা থেকে বেরিয়ে আসে, লিলি সে জন্য উৎকর্ণ হয়।

মামা বলল না, বলল না যে, ভয়ানক ভালোবাসা না হলে চাখবার কথা মনেই জাগে না। যেমন সেই বর্মীটার ওপর মামার তেমন ভালবাসা হয়নি বলে—কেমন যেন একটু বৈরাগ্য হয়েছিল বলে; তাকে মুখে তোলবার কথা মামার মনেই হয়নি।

তুমি বলছ যে মামা আমাদের তত ভালবাসে না? অন্তত তত ভয়ানক ভাবে নয়? তাই তেমন ভয় নেই বলছ?

ভালো যা বাসে তাতো এক চড়েই বুঝেছি। এই বলে শিশির আবার নিজের গালে আরেক হাত বুলিয়ে নেয়। উঃ, যা জ্বলছে।

এতক্ষণে লিলি তবু কিছু ভরসা পায়। অমন কঠোর-হৃদয় মামার ভালোবাসার পাত্র হওয়া সহজ নয়, সে কথা সত্যি। এবং ভালোই যদি না বাসেন, তা হলে কেন আর মামা অত কষ্ট করে' তার হৃদয়ের চেয়েও জায়গায়, তার উদার উদরের পরিধির মধ্যে অন্যান্য খাদ্য খাদকদের হটিয়ে, উপাদেয় চর্ব-চোষ্যদের বাদ দিয়ে তাদের জন্য স্থান সঙ্কুলান করতে উদ্ব্যস্ত হবেন ?

তাই ভালো। কেবল যদি চড়ের ওপর দিয়েই যায়, সেও মঙ্গল। লিলি বলে : চর্চাড় না হতে হলেই হোলো ?

॥ প্যারাসুট বাহিনী ॥

ত্যাখ ত্যাখ। নৈঋৎ কোণ থেকে কী একখানা আসছে তাকিয়ে ত্যাখ। আকাশের দিকে লিলির দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিশির।

একখানা এরোপ্লেন ! লিলির বুঝতে দেরী হয় না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে আসছে।

এরোপ্লেন তো বটেই; কিন্তু নৈঋৎ কোণ থেকে উঁকি মারছে কিনা, দেখছিস নে ? সেইটাই ভাবনার কথা।

ওটা নৈঋৎ না কি ? নৈঋৎ কোণ কোনটা, দাদা ? কে জানে। তবে খারাপ যা কিছু সব ঐ কোণ দিয়েই আসে। ঝড় ঝাপটা সাইক্লোন সব। এরোপ্লেনও কি কম মারাত্মক আজকাল ? সাইক্লোনের চেয়ে কিছু কম কি ? আমাদের ওপরে বোমাই ফেলবে কি না কে বলতে পারে ?

কিন্তু ওটাই যে নৈঋৎ কোণ তা তো আর তুমি ঠিক জানো না।

জানি না মানে ? হতে বাধ্য মারাত্মক যা কিছু মন্দ যা কিছু আর কোন্ দিক দিয়ে আসবে শুনি ? তারা কেবল ঐ এক কোণ ঠাসা হয়ে রয়েছে। নৈঋৎ কোণ।

ওটা যে বদ মতলবে আসছে কি করে' তুমি বুঝলে? ওর চেহারা দেখেই আমি বুঝেছি। ওর চাল-চলন দেখেই। ওর হাবভাবেই ধরা পড়ছে। সমস্ত এই দূর থেকে দেখেই টের পেয়েছি। আমার দূরদর্শন আছে এটা তো তুই মানিস? নইলে সেই নকশাটা বার করলাম কি করে?

এ-কথার পর আর কোনো কথা চলে না। লিলি চুপ করে, যায়। ভূয়োদর্শী লোকেরাই দূরদর্শী হয়ে থাকে, কে না জানে? যাঁরা দূরের জিনিষ দেখতে পায়, তারা ভূয়োও অনেক কিছু যে সে ছাখে, এ কথাই-বা কে অস্বীকার করবে? মনে মনে এই সব খুঁচিয়ে খতিয়ে, লিলি বেশী আর উচ্চবাক্য করে না। এরোপ্লেন রীতিমত এবং কোণের নৈঋৎ, যখন তার দাদার কাছে প্রাঞ্জল, জলের মতই প্রাঞ্জল, তখন একবাক্যে তার নিজের কাছেও পরিষ্কার —খুব ধবধবে পরিষ্কার না হলেও মেনে নেবার মতো মানানসই হতে বাধা কি? দ্যাখ দ্যাখ এরোপ্লেনটা কি রকম ডিগবাজী খাচ্ছে—দ্যাখ লিলি। ঘুড়ির মতন লাট খাচ্ছে কেন দাদা? লিলিও জিগ্যেস করে।

মতলবটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না তো। লাট খেতে খেতে বেটপকা সমুদ্রে না পড়ে যায়। তাহলেই—তাহলেই—অবরুদ্ধ নিশ্বাসে শিশিরের কণ্ঠরোধ হয়।

তা হলে কি হবে?

কী আবার হবে। সলিল সমাধী। যা হয়ে থাকে। শিশির মহাপুরুষ না হলেও, বয়ঃক্রমের অবিচারে। এখনও না হতে পারলেও, মহাবালক তাকে বলতেই হয়। কেন না সে কেবল দূরদর্শীই নয়, বেশ একটু বাক্যসিদ্ধও বই কি। বলতে না বলতে, এরোপ্লেনটা ওল্টাতে পাল্টাতে, একেবারে সমুদ্রের বুকের ওপর এসে খাবি খায়। কিন্তু তার আগেই—

তবে আগেই তার চালক, একমাত্র আরোহীই খুব সম্ভব

এরোপ্লেন বলে, প্যারাসুট বগলে, ফাঁকা হাওয়ায় পদার্পণ করছে। সুবিস্তৃত ছত্রাকার বস্তুটি অবিলম্বে শূন্যমার্গে ঝুলে পড়ছে।

আকাশ বিদীর্ণ করে' আস্তে আস্তে থামতে থাকে সে।

শিশির সবিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। প্যারাসুটবাহিনী। তার মুখ থেকে বোল বেরোয়। প্যারাসুটবাহিনী বলছ কি দাদা? ভাষায় একম্বিধ লাঞ্ছনায় লিলি মৃদু আপত্তি না জানিয়ে পারে না: শুধু একজন লোক প্যারাসুটবাহী বলতে পারো বরং।

লোকটা মেয়ে কি পুরুষ এতদূর থেকে দেখতে পাচ্ছি না কি? দূরদর্শী হয়েও নিজের দুর্বলতা স্বীকার করতে শিশিরের লজ্জা হয় না:

আর মেয়ে হলে বাহিনীই তো হবে, ব্যাকরণেই বলে' দিয়েচে। যেমন সিংহবাহিনী? সিংহবাহিনী বলতে কী বোঝায়? একগাদা সিংহ কী? মোটেই না। সিংহবাহিনী মানে মা দুর্গা। তার মানে—উদাহরণ দিয়ে বিশদ করে' ব্যাখ্যা সে বিস্তৃত করে: তার মানে মেয়েরা একাই একশ কি না। একাই একটা বাহিনী।

তোমার মাথা। লিলি, নিজে মেয়ে হলেও এতখানি নির্জলা প্রশংসা, আত্মপ্রশংসা, বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়।

এই যা, লোকটাও যে জলে পড়ল দেখছি। ভেবেছিলাম, উড়তে উড়তে ডাঙ্গায় এসে পৌঁছবে।

ডুবে গেল যে লোকটা। লিলির অস্ফুট আর্তনাদ!

এখানে তো আর কেউ নেই। কী মুশকিল ছ্যাখোতো। শিশির ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে: আমাকেই গিয়ে বাঁচাতে হবে দেখছি।

তুমি? না না—তুমি না। লিলির স্বরে আবেগ না দাদা। সকাতর আবেদন।

কেন আমি সাঁতার জানিনে? ডুবন্ত লোককে বাঁচাতে পারিনে নাকি আমি?

'যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না?' লিলির জবাবে এই কথাটা বলতে গিয়ে শিশির থেমে যায়। উপমাটা ঠিক তার উপযুক্ত নয়—বীরত্বব্যঞ্জকও না—যথোচিত নয় তার পক্ষে। একটু ভেবে নিয়ে সে বলে: যে খাতায় অঙ্ক কষে, সে কি ব্লাক বোর্ডে কষতে পারে না?

এই বলে শিশির মালকোঁচা মেরে তৈরী হয়ে নেয়: লোকটাকে কেমন করে অবলীলাক্রমে উদ্ধার করে' নিয়ে আসি তুই চেয়ে দ্যাখ।

শিশির সমুদ্রের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

লিলি চীৎকার করে' বাধা দিতে যায়, কিন্তু তার আওয়াজ বেরোয় না। সমুদ্রের বুকে শিশির-সম্পাত,—কাঠের পুতুলের মত সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছাখে। তার দু-চোখের উককূল আরেক লোনা জলে ছাপিয়ে উঠে।

শিশির সাঁতারে কোন রকমে মজ্জমানের কাছাকাছি যেতেই তাকে হস্তগত করবার আগেই, লোকটিই শিশিরকে পাকড়ে ফ্যালে।

একি। তুমি আবার কে হে? তুমি এখানে কেন? পরিষ্কার বাংলাতেই প্রশ্ন করে সে। এবং দেখা যায় প্যারাস্যুটবাহিনী নয়, লোকটা প্যারাস্যুট বাহন।

তোমাকে বাঁচাতে এলাম। শিশির বলে তুমি ডুবে যাচ্ছ। আমাকে, আমাকে বাঁচাতে। লোকটি না হেসে পারে না। কী সর্বনাশ এক কাজ করো। আমার কাঁধ আকড়ে পিঠের সঙ্গে লেপটে থাকো এই বলে' সেই লোক ডুবন্তরা যেমন করে খড় কুটো পাকড়ায়, তেমনি করে' শিশিরকে ধরে নিজের পিঠে জড়িয়ে নেয়—যেমন করে' স্নান যাত্রীরা গামছা কাঁধে ফ্যালে আর কি।

উদ্ধার করতে গিয়ে দুর্ভাগ্যক্রমে শিশির নিজেই উদ্ধৃত হয়ে পড়ে।

শিশিরকে পৃষ্ঠসাৎ করে' লোকটা যদৃচ্ছ সাঁতার কেটে তটভূমির দিকে এগুতে থাকে।

— ঢেউয়ের কিরকম জোর দেখচ। আর কী ভীষণ আণ্ডার কারেণ্ট। আমি না থাকলে এতক্ষণ তলিয়ে কোথায় ভেসে যেত! লোকটি, শিশিরের বোঝা ঘাড়ে ফেলেই শিশিরকে বোঝাতে চায়।

শিশির কিন্তু ধন্যবাদ জ্ঞাপনের কোনো কারণ খুঁজে পায় না। কৃতজ্ঞতারও কোনো বিজ্ঞাপনও ছায় না।

ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে লাফাচ্ছে, ঐ মেয়েটি কে?

আমার বোন। শিশিরের কাটা জবাব।

ও আবার তোমাকে উদ্ধার করতে ছুটে আসবে না তো? কিম্বা আমাকেই হয় তো? তাহলেই তো আমি গেছি। আমার তো একটি মাত্র পিঠ;—লোকটি বলে।

একমাত্র পিঠ তো কী হয়েছে?

শিশির উসকে ওঠে, তার একটু উষ্মাই হয়। লোকটা নিজের পীঠস্থানের মাহাত্ম্য নিয়ে যে রকম বাড়াবাড়ি লাগিয়েছে, তাতে ওর পৃষ্ঠপোষকতার চেয়ে সলিল সমাধিও শ্রেয়—ঢের শ্রেয় বলে' শিশিরের ধারণা হতে থাকে। পৃষ্ঠ ধারন করে লোকটা যেন ওর মাথা কিনতে চায়। কে ওকে অমন করে' পিঠে ধরতে বলেছিল?

একটি তো পিঠ, তাই সে নিয়ে কজনের দ্বারা উদ্ধার হব? তাও আবার তুমিই এখন গ্রাস করেচ? পরহস্তগত পিঠ নিয়ে কজনের দ্বারা উদ্ধার হওয়া যায় তুমিই বলো?

কে আবার তোমাকে উদ্ধার করতে আসছে? শিশির জানতে চায়।

বলা যায় না তো, ঐ মেয়েটাও আসে যদি? তোমার যখন বোন' পরের জন্য পরের প্রাণ দানের জন্য নিজের প্রাণ দেবার বাতিক ওরও থাকতে পারে, বিচিত্র কি? তাহলে বাপু, আমি পারব না, পেরে উঠব না। তোমার নিজের বুকেই ওকে স্থান

দিতে হবে তাহলে। আগে থেকেই আমি বলে রাখছি কিন্তু।

শিশির কিছু বলে না, চটে মটে চুপ করে থাকে। উপকার করতে এসে উপকৃত হলে, বড় বড় বীররাই বিরক্ত হয়ে যায়—শিশিরের ও বিরক্তি ধরবে সে আর বেশী কি?

আস্তে আস্তে ওরা উপকূলে পৌঁছুয়—ডাঙ্গায় এসে পরস্পরের নামায়।

উঃ। লোকটা কপালের ঘর্মাক্ত জল মুছে ফ্যালে: এই তোড় ভেঙ্গে আর ঢেউ ঠেলে একটা লোককে টেনে নিয়ে আসা কি সোজা? প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে প্রাণ বেরিয়ে যায়। বাপ। লোকটি হাঁপ ছাড়ে: মানে তোমার দাদার কথাই বলছি। আমাকে উদ্ধার করতে বেচারী হিমসিম খেয়ে গ্যাছে।

আমার দাদা ওই রকম। দাদার গর্বে ও গৌরবে লিলি টইটম্বুর: পরের প্রাণ দান করতে গিয়ে নিজের প্রাণ দিয়ে ফ্যালে। কতোবার।

তাইতো দেখচি। এরকম দাদা নিয়ে ঘোরাফেরা নিরাপদ নয়।

নয়ইতো। আরেকটু হলে আমি নিজেই তো জলে পড়েছিলাম। যদিও সাঁতার জানিনে তবু দাদার প্রাণ বাঁচাতেই ঝাঁপিয়ে পড়তে হোতো।

উঃ, বড্ড বেঁচে গেছি দেখছি। লোকটা অনেকখানি নিশ্বাস ফেলে দ্যায়: মানে তুমিই বড্ড বাঁচা বেঁচে গেছো আজ।

কথা কইতে কইতে তিনজনে শহরের মধ্যে এগুতে থাকে। শিশির খুব কমই কথা বলে। কি করে এরোপ্লেনের কল বেগড়াল, কজ্জাগুলোকে কিছুতেই আর কায়দায় আনা গেল না, সব সমেৎ সমুদ্র গর্ভে তলাবার আগে কোন সতর্ক মুহূর্তে মাথা এবং প্যারাস্যুট খেলিয়ে অধোগামী এরোপ্লেনের কবল থেকে, সবলে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, শূন্য মার্গে নিরুদেশেই, নিজেকে তিনি ভাসিয়ে দিয়েছেন—এই সব কথা। কোথা থেকে আসছেন, কোনখানেই

বা গন্তব্য, এবং কেনই বা নৈঋৎ কোণকে এভাবে অগ্রাহ্য করে তাঁর এই সব অভ্রভেদী পঞ্জিকা—বিরুদ্ধ যাতায়াত—তার কোন কথাই কিন্তু ভদ্রলোক পাড়তে দিচ্ছিলেন না।

লিলি উচ্চবাক্য করে, শিশিরও উসখুস করতে থাকে—কিন্তু যেভাবেই শুরু হোক না কেন, প্রশ্ন পত্র চেপে যাবার ভদ্রলোকের অদ্ভুত ক্ষমতা।

অবশেষে তারা বেড়াতে বেড়াতে শহরের বড় একটা বাড়ীর পাশে এসে পড়ল। বাড়ীটার গায়ে, সচিত্র এক বিজ্ঞাপনে, দশ হাজার টাকা পুরস্কার দেবার একটা ঘোষণা জ্বলজ্বল করছিল।

শিশির না দেখেই বলল : ক্রসওয়ার্ড পাজ্‌ল বুঝেছি।

লিলি এগিয়ে যায় : কই দেখি।

ও দেখে কী হবে? কেউ সল্‌ভ করতে পারে না। পারতে গেলে সহজ কথার জায়গায় শক্ত কথা, শক্ত কথার জায়গায় সহজ কথা হয়ে যায়—যা করবি ঠিক তার উল্টোটা হবে। তার মানে, উল্টোটাই হচ্ছে ঠিক। এন্ট্রি ফিই মাটি, অনেক টাকা গেছে আমার। শিশিরের কাছে স্পষ্ট কথা—শিশির ওসব দিকে ভুলেও আর ভ্রূক্ষেপ করবে না। অভিজ্ঞতাবান উদাসীন শিশির।

ভদ্রলোক কিন্তু একবার চোখ বুলিয়েই বিজ্ঞাপনটা আড়াল করে দাঁড়ান : হ্যাঃ। এসব পুরস্কার কেবল ঘোষণা করাই সার। কেই বা পাচ্ছে, আর কেই বা নিতে যাচ্ছে! কাউকে পেতে দিলে তো।

এই বলে ওদের সাথে হন হন করে উঠে পড়েন—এবং পদের আর একটি কথাও না বলে, তীর বেগে তিরোহিত হয়ে যান। লোকটার আকস্মিক অন্তর্ধানে শিশির একটু বিস্মিতই হয়।

চলো না দাদা, দেখে আসি পাজ্‌লটা। পারা যায় কিনা দেখা যাক। বর্মার ক্রস্‌ওয়ার্ড হয়তো অতো শক্ত হবে না।

তোর ভারী টাকার লোভ। পাবিনে, তবুও। বলছিনে, আমার অনেক টাকা—ওরা মেরে দিয়েছে। ওই ক্রসওয়ার্ডরা।

শিশির আর লিলি আবার সেই বাড়ীটার পাশে ফিরে আসে। আরে এ বাড়ীটা তো শহরের একটা থানা বলে বোধ হচ্ছে? হ্যাঁ থানাই তো। ইতস্তত লাল পাগড়ি না দেখা যায় যে। কিন্তু এ আবার কি রকম ক্রসওয়ার্ড।

বিজ্ঞাপনের গায়ে ইংরাজী ভাষায় লেখাঃ নগদ দশ হাজার টাকা পুরস্কার।

হংকং-এর জেল হতে কিছুদিন পূর্বে পলাতক দুর্ধর্ষ বাঙ্গালী দস্যু —বক্রেশ্বর আইচ—যে কেহ ইহাকে ধরাইয়া দিলে বা সঠিক সন্ধান দিতে পারিলে উক্ত পুরস্কার লাভ করিবেন।

তবে, ক্রসওয়ার্ড না হলেও পাজল যে সে বিষয়ে ভুল কি? সেই বিজ্ঞাপনের সঙ্গে যে ফোটো লাগানো, সেই ফোটোর সঙ্গে সমুদ্রগর্ভ থেকে সদ্যোত্থিত ঐ ভদ্রলোকের ভয়ঙ্কর মিল। বেধড়ক মিল, যাকে বলে।.....

॥ অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক ॥

বাড়ী ফেরার পথে শিশির চুংইগাম কেনে। গোটা কতক নিজের এবং লিলির মুখে অর্পণ করে বাকী গুলো রেখে দ্যায়।

মামার পায়ে লাগানো যাবে এগুলো। শিশির বলে। মুখের বদলে পায়ে কেন, লিলি ভেবে পায় না। কেন, পায়ে কেন? মুখ থাকতে—পায়ে? সে জিজ্ঞেস করে।

আন্দাজ কর দেখি। বুঝব তোর বুদ্ধি। শিশিরের রহস্যময় চাহনি। লিলি আন্দাজ করেঃ মামা বুঝি ফের আবার ভূপর্যটনে বার হবে মনে করছ? তাই চুইংগাম, মামার পায়ে লাগিয়ে তাকে আটকে রাখতে চাও?

চুইংগাম যেমন চর্বনের—চর্বিত চর্বনের অন্তরায়, তেমনি নিশ্চয়

ভূপর্যটনকারীর পদে পদে বাধার সঞ্চার করবে, তার নিজের রোমন্থনের মুশকিল দেখে এই পর্যন্ত লিলি অনুমান করতে পারে।

তোর মাথা।—তোর কিছু মাথা নেই। তুই একটা গাধা। শিশির সাদা বাংলায় বলে ছায়।

মুখে লাগালেও মানে বুঝতুম। পাছে মামা খবর আর কারো কাছে ফাঁস করে ছান সেই কারণে মামার মুখ বন্ধ করার মতলবে—

মোটেই না, মোটেই না। শিশির বাঁধা দিয়ে বলে : কেন চুইংগাম কিনলাম বলি। মামা নিশ্চয়ই এতক্ষণে মাথা খাটিয়ে প্ল্যানটার রহস্যভেদ করেচে। করেনি কি ?

নিশ্চয় ! মামার কার্যকারিতায় লিলির অগাধ বিশ্বাস।

আর আমি মামার পা খাটিয়ে তার সমস্ত জেনে নেব। শিশির জানায়।

পা খাটিয়ে ? মামার পা ? লিলি আবার গোলক ধাঁধার মধ্যে পড়ে, কিছু বুঝতে পারে না।

এই চুংইগাম এখনই গিয়ে মামার যাবতীয় জুতো আর স্লিপারের তলায় ভালো করে এঁটে দেব। তাদেরই এক জোড়াকে পায়ে দিয়ে তো মামার সেই গুপ্ত কক্ষের সন্ধানে বেরুবে। আর যে-যে ঘরের ভেতর দিয়ে যেখান দিয়েই যাক না—মামার পদক্ষেপে মাটিতে চুইংগামের চিহ্ন থেকে যাবে। চুইংগামরা তো সহজ পাত্র নয়।

লিলি অবাক-হয়ে দাদার বুদ্ধির বহর ছাখে, মুখ দিয়ে কথা সরে না।

বাড়ী ফিরে লিলি আর শিশির জুতোদের খোঁজ খবর নিতে থাকে ; এমন সময়ে মামা রুদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে ভয়ঙ্কর সোরগোল শুনতে পায়।

তুমি তাহলে এই বাড়ী আমাকে ছেড়ে দিতে রাজী নও ? অপরিচিত কণ্ঠের বাজখাই আওয়াজ।

নাঃ কিছুতেই না। মামার গলা।

ভেবে ছাখো, আমি কদ্দূর থেকে এসেছি? কিরকম বিপদ ঘাড়ে নিয়ে প্রাণ তুচ্ছ করে—

আমার বয়েই গেল।

এ বাড়ী হাতে রেখে তুমি কি করবে? পুরনো পচা বাড়ী—এর ভাড়াটেও পাবে না কোন দিন। এই ইঁট কাঠ বরগারই বা কত দাম হবে। যদি চাও উচিত মূল্যের বেশী দিয়েও আমি এটা কিনে নিতে পারি।

হ্যাঁ, এই বাড়ী আমি বেচতে গেছি কিনা।' মামার জবাব শোনা যায়ঃ এ বাড়ীর দাম আমার জানা আছে। তোমাকে আর বেশী করে আমায় জানাতে হবে না।

হুম! অপরিচিত গলার স্বর এবার বদলায়ঃ হুম বুঝেচি এই বাড়ীর কোনোখানে গুপ্তধন লুকানো আছে, তুমি ভেবেচ বোধ হয়? যদি লুকানোও থাকে, কোনো দিন তুমি তার সন্ধান পাবে না। তার প্ল্যানই খুঁজে পাবে না কোন দিনই। সারা জন্ম খুঁজলেও তোমার হাবা বুদ্ধির কর্ম নয়।

পাব কি পাব না, পেয়েছি কি পাই নি—সে আমি বুঝব। মামা জানায়ঃ তোমাকে বলতে গেছি আর কি। কি আমার গুরুঠাকুর এলেন।

বটে? এই কথা? আচ্ছা, আমিও দেখে নেব। যদি না দেখে নি, তা হলে আমার নাম—আমার নাম—

বলতে বলতে ঝাঝালো গলায় ভদ্রলোক দরজা খুলে তীর বেগে বেরিয়ে যান।

শিশির ও লিলি সিঁড়ির আড়াল থেকে মুখ বাড়িয়ে ছাখে—সবিস্ময়ে তাকিয়ে ছাখে—তর্জন গর্জনকারী নবাগতটি আর কেউ নন, তাদের সদ্য পরিচিত শ্রীমান বক্কেশ্বর আইচ।

সারাদিন শিশির আর লিলি ওত পেতে থাকে, মামার সবকটা

জুতোর পরিচর্চা সেড়ে, মামা সুলভ গতিবিধির মাঝখানে এখানে সেখানে, মামার যাত্রা পথের সর্বত্র, প্রলোভন জনক করে ছড়িয়ে রেখে ছ্যায়। যে দিকেই মামা পা বাড়াবেন, এক জোড়া জুতো পাবেন—তাঁর পায়ে পড়ার জন্যে অপেক্ষা করছে। জুতোর জন্যে মামাকে ইতস্তত করতে হবে না—পায়ের গোড়ায়—গোড়ালির আগায় পায়চারির নাগালেই ওরা পড়ে রয়েছে।

কিন্তু সমস্ত বজ্র আটুনিরই ফসকা গেরো আছে—সারাক্ষণ মামার জুতোদের (এবং মামাও বাদ নয়) নজরে নজরে রেখে বিকেলের দিকে, বাড়ীর সামনের রাস্তা দিয়ে পাঁপড় ভাজাওয়ালা ফিরি করে যাচ্ছে দেখে কেনার লোভ দমন করতে না পেরে শিশির আর লিলি যেই না দৌড়ে গেছে আর পাঁপর মুখে দৌড়ে এসেছে—আর এর মধ্যেই ফিরে ছ্যাখে—মামা নেই। মামার দরজা ফাঁক।

মামার ঘর খালি। কোথায় গেল মামা জানা শোনা সমস্ত ঘর আঁতি পাঁতি কোরে খোঁজা হোলো—কোনো ঘরেই মামা নেই।

নিশ্চয় তবে—তা হলে—সেই রত্ন সংকুল গুপ্ত কক্ষেই মামা বিরাজ করছেন এতক্ষণ ?

তক্ষুণি মামার বত্রিশ জোড়া জুতোর—হিসেব নেয়া হোলো—গোণাগুন্তি করে মিলিয়ে ছ্যাখা গেল, হ্যাঁ, ঠিক। এক জোড়া কমই বটে। মামার পায়ে পায়ে—মামার সাথে সাথেই উধাও হয়েছে সেই মানিক জোড়।

এইবার চুইংগামের চাকচিক্য লক্ষ্য করে অন্বেষণের পালা। শিশির! শিশির বিচক্ষণ গোয়েন্দার মতো খুঁটিয়ে ছ্যাখে আর খানিক এগোয়—লিলি যায় তার পেছনে পেছনে। দাদা যা করতে বলে তাই করে। লিলির চোখ বড়ো বড়ো, নিশ্বাস রুদ্ধ আর বুকের মধ্যে টিপটিপানি।

এঘর ওঘর পেরিয়ে—লম্বা ঘর, চওড়া ঘর, গোল ঘর অতিক্রম করে—এক ফালি ঘর, তিন কোণা ঘর, তেরছা ঘর পার হয়ে—

তুবার উপরে উঠে, তিনবার নীচে নেমে—অবশেষে সোঁদা-গন্ধ-ওলা গুদাম-ঘরের মতো, পোড়ো ঝোড়ো চামচিকে ওড়া একটা ঘরের নেপথ্যে চুইংগাম লাঞ্ছিত পদ-চিহ্নদের অনুসরণে ওরা গিয়ে উত্তীর্ণ হোলো।

নেপথ্য থেকেই জরাজীর্ণ জানলার আনাচ থেকে উঁকি মেরে দেখল, এক হাতে টর্চ, আরেক হাতে সেই প্ল্যান খানা নিয়ে, সেই গুদাম ঘরের দেওয়ালে কী যেন খোঁজাখুঁজি করছেন মামা।

কী খুঁজছেন, বুঝতে দেরী হয় না শিশিরের। ওরই মধ্যে কোনখানে অর্থ পূর্ণ দেরাজ—দেওয়ালের অন্তর্গত হয়ে, দেওয়ালের সঙ্গে একাকার হয়ে ছলনা করছে তাকে আবিষ্কার করারই মামার অধ্যবসায়।

শিশির আর লিলি পা টিপে গুদাম ঘরের মধ্যে সেঁধোয়—

খুট করে আওয়াজ হয় একটু। অমনি তীব্র টর্চের আলো এসে ওদের মুখের ওপর আছাড় খায়।

কে? কে ওখানে? মামার খনখনে গলার ভেতর থেকে ধারালো প্রশ্ন আসে—মামার পকেট থেকে ঝকে ঝকে পিস্তল বার হয়—একবারে যুগপৎ।

আমি? আমরা। আমরা মামা। শিশিরের কম্পিত কণ্ঠ।

কে? কে তোমরা? মামা চিনতে পারে না—পিস্তল লক্ষ্য করেন।

আমরা তোমার ভাগনে। শিশির লিলিকে আড়াল করে দাঁড়ায়—গোলাগুলির যা কিছু ঝড় ঝাপটা আসুক, ও নিজেই বুক পেতে নেবে লিলি দাদাকে আঁকড়ে ধরে পেছন থেকে।

ভাগনে?.......... ভাগনে! মামার বিকট অট্টহাসি শোনা যায়ঃ ভাগ নেবার ভাগনে আমার।

তার পর হাসি থামিয়ে, টর্চের আলোয়, উন্মুক্ত, পিস্তলে মামা এগিয়ে আসতে থাকেন—তাঁর তুচোখে পৈশাচিক উল্লাস।

সোজা হয়ে দাঁড়া। ঠিকঠাক হয়ে থাক। আমি একটার পর একটাকে সাবাড় করব। পিস্তলটা আজই কিনেছি। কোনো কাজের কিনা এটা, তাও তো পরীক্ষা করা দরকার, আরেকটা কই, আরেক জন গেল কোথায়? দুটোকেই এক সঙ্গে খতম করব— কোনো ওজর আপত্তি শুনছিনে। কিচ্ছু না।

এমন সময়ে এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে যায়। অভাবিত এবং অভাবনীয় কাণ্ডটা যে ঠিক এই রকম সময়েই ঘটবে তার আর আশ্চর্য কি? ওই মস্ত কাণ্ডটা তো ওৎ পেতে এই ধরনেরই যুৎ খোঁজে।

গুদাম ঘরের পশ্চাৎ দিক থেকে আরেকটা প্রবলতর টর্চের আলো মামার পিঠের ওপর এসে পড়ে—মামার পশ্চাতে এসে সহসা যেন এক ধাক্কা লাগায়।

য়্যা? এধার থেকে আবার কে? মামার অগ্র পশ্চাৎবোধ লোপ পায়—মামা কোনদিকে ফিরে কোনটা সামলাবেন স্থির করতে পারেন না। যেমন আছো তেমনি থাকো। নড়োচড়ো না। একটু এদিক ওদিক হয়েছে কি মাথার খুলি উড়ে গেছে। পেছনের টর্চার—(কিম্বা টর্চারার) রাজখাই গলার হুকুম লাগান।

মামা সেই অবস্থানেই তথৈবচ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। সেই অন্ধকারাচ্ছন্ন লোকটি আলোক হস্তে এগিয়ে এসে, মামার হাত থেকে প্ল্যান এবং পিস্তলটি কেড়ে নেয়।

একি? মামা—তুমি? তুমিই মামা হয়ে ভাগনের সর্বনাশ করতে এসেচ? ফের এসেচ আবার? ব্রজেশ্বরবাবুর কাতর কণ্ঠ থেকে বার হয়—

সকালে যখন বললুম তখন হোলো না? এখন তোহলো কেমন? বক্কেশ্বর আইচ হো হো করে হাসেন—প্যাঁজ-পয়জার দুইই হোলো তো। এবং লক্ষ্মী ছেলের মতো নিজের বিছানায় ফিরে যাও গে।

মামার হাতে ভাগনের মরণ—চিরদিনই জানি। ব্রজেশ্বর বিদীর্ণ কণ্ঠে ব্যক্ত করেন।

শিশির পশ্চাৎবর্তিনীর কানে কানে ফিস ফিস করে: মামার ওপরেও মামা আছে। দেখছিস তো লিলি ?

বঙ্কেশ্বর টর্চটাও কেড়ে নেন ব্রজেশ্বরের হাত থেকে।

॥ মামার ওপরেও মামা আছে ॥

নামার ওপরেও মামা আছে দেখছিস তো লিলি। লিলির কানে কানে শিশির বলে: মামার মামারা কত ভয়ানক ভেবে দ্যাখ।

ভগবানও আছেন দাদা। লিলি ফিস ফিস করে। হ্যাঁ, ভগবানকে আর থাকতে হোতো না, আর একটু হলেই গুলির চোটে এফোঁড় ওফোঁড় হয়ে যেতে হোতো।

মামা যেমন করে রিভলবার তুলেছিল। ভাগ্যিস! ভাগ্যিস—এই অন্য মামাটা—মামার স্কোয়াররুটটা এসে পড়ল তাই রক্ষে! লোকটা একটা জলজ্যান্ত বিভীষিকা। তাই না—দাদা ?

বিভীষিকা ? বিভীষিকা কেন ? একটুও বিভীষিকা না! অন্ততঃ আমার কাছে তো নয়। তবে হ্যাঁ, ভালো জাত বটে! আমি তো আজ সকালে ওকে জল থেকে জ্যান্ত করেছি।

তোমার একটুও ভয় করে নি ? একটুও না।

তবে কাঁপছিলে কেন অমন করে ? লিলি জানতে চায়।

আমি কাঁপছিলুম ? আমি ? আমি না তুই ? শিশিরের উল্টো চাপ।

আমার তো হাত-পা কাঁপছিলো। লিলি সমস্ত দোষ অসহায় হাত-পার ঘাড়ে চাপিয়ে দ্যায়। পা হাত কেবল।

তাহলেই হোলো। আর তুমি যদি আমাকে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে অমন করে কাঁপতে থাকো—তুমিই হও আর তোমার হাত পাই হোক—তখন না কেঁপে আমি করি কি? শিশির নিজের অনুকম্পার কারণ দেখায়ঃ ভাগ্যিস তুমি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যাওনি—তাহলেই হয়েছিল আর কি!, আমাকেও চিৎপাত হতে হতো সেই সঙ্গে!

লিলির আনুকূল্যে শিশিরের যে অনিবার্য অধোগতি ঘটতে পারত, অথচ ঘটেনি—তার জন্যে লিলিকে দায়ী করায়, লিলির রাগ হয়ে যায়। যা ঘটেনি তার সে কি কৈফিয়ৎ দেবে? সে চুপ করে থাকে।

কিন্তু যাই বল, গুলিটুলির চলাচলের সময়ে অত কাছাকাছি থাকা ভালো নয়। অমন করে আমার পিঠ লেপটে এক হয়ে থাকা তোর ঠিক হয়নি। শিশির ভালো করে সমঝে দ্যায়ঃ আমার আড়ালে একটু দূরে গিয়ে দাঁড়ালে ভালো হতো।

লিলি কিছু বলে না। তার অভিমান হয়ে যায়। তার কি দোষ? সে কি গায়ে পড়ে পৃষ্ঠপোষকতা করতে গেছল? দাদাই তো তাকে আড়াল করে নিজের পৃষ্ঠ রক্ষা করেছিলেন। সে কথা এখন ওর মনে পড়ছে না, বা রে!

যেমন পিঠ আঁকড়ে দাঁড়িয়েছিলি, গুলি ছুঁড়লে মজাটা টের পেতিস। গুলিটা আমাকে ভেদ করে তোর ভেতরে গিয়ে সেঁধতো! গুলিদের কি ভেদাভেদ জ্ঞান আছে? মেয়েছেলে বলে একটুও খাতির করতো না। সোজা ফুড়ে এস্পার ওস্পার হয়ে বেরিয়ে যেত।

যেত—যেত—লিলি যেত—দাদার কি? উনি সামনে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির যাতায়াতে কতটা বাধা-সৃষ্টি করছেন, শুনি, নেহাৎ সেই জলজ্যান্ত বিভীষিকাটা ঠিক সময়ে এসে পড়ল বলেই না? তাই বলেই না ফাঁড়াটা অত সহজে কেটে গেল—ভুল পথ দিয়ে কেটে বেরিয়ে গেল ফাড়াটা?

লিলি গুম হয়ে থাকে। কোনো জবাব দ্যায় না।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের নিরন্ধ্রতা খান খান করে খনখনে আওয়াজ ফেটে পড়তে থাকে—

তাদের মামার আর্তনাদ।

বক্কেশ্বর আইচ ব্রজেশ্বর বড়ুয়ার হাত থেকে পিস্তল, প্ল্যান, পরিশেষে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে পলায়ন করার পর, এতক্ষণ পরে তার সম্বিৎ ফিরে আসে। তিনি উচ্চৈঃস্বরে হায় হায় করে ওঠেন।

যাক, মামার কিছু হয়নি, বাঁচা গেল। শিশির বলে : এতক্ষণ ধরে মামার কোনো সাড়া না পেয়ে ভাবছিলুম আমাকে বুঝি সাবাড় করে গেছে। কিন্তু এতক্ষণে—প্রত্যক্ষ না দেখা গেলেও স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে মামাকে।

হুম—একেবারে না মেরে ফেলতে পারলেও, মামাকে নিয়েও তো পিট্টান দিতে পারত লোকটা।

হ্যাঁ, মামা যা বহুমূল্য একটি রত্ন। কিন্তু লোকটার নিজের পিঠের ওপর টান আছে বলেই আমাকে নিয়ে পিঠ্‌টান ছায়নি। একটা মামার বোঝা তো বড় কম নয়।

শিশির হাসে। একবার পিঠে করে ছাখ না।

তার কাছে তো ভাগনের বোঝা। লিলি বোঝবার চেষ্টা করে : মামা তো সেই লোকটার ভাগনেই তো।

মামার কাতরোক্তি ক্রমশঃ বেড়েই চলে। অন্ধকারে কোন-খানে দাঁড়িয়ে যে তিনি অনুশোচনা করছেন ঠিক ঠাওর হয় না, তবু ওরই মধ্যে হাতড়ে হাতড়ে, শব্দের ধারা আর ক্রন্দনের ধারা অনুসরণ করে যারপর নাই বিলাপকারীর কাছাকাছি গিয়ে তারা দাঁড়ায়।

মামা! মামা! ডাক ছাড়ে শিশির।

আর মামা। ব্রজেশ্বর চেঁচিয়ে ওঠেন : তোদের জন্যেই আমার এই সর্বনাশ আজ।

আমাদের জন্যে? আমাদের জন্যে কেন? শিশির একটু বিস্মিতই।

একদিকে তোরা ভাগ নেবার ভাগনেরা। আরেক দিকে মামা সাক্ষাৎ মামা। সর্বস্ব নেবার মামা। দু দিকেই ভারী পাল্লা কোন দিক আমি সামলাই? বিক্ষুব্ধ আক্ষেপ ব্রজেশ্বরের।

তা—আমরা—আমরা কি করলাম? শিশিরের বিমূঢ় প্রশ্ন।
তোরা আর কি করবি? কিছুই করতে পারলিনে। মামাই সর্বস্বান্ত করে চলে গেল। ব্রজেশ্বরের আফসোস বাগ মানে না: বাঘ এসে পড়লে বেড়ালরা কি কিছু করতে পারে? বেড়ালদের সুবিধা করতে দেবে—বাঘরা সে পাত্রই নয়। তারা নিজেরাই সব সাবড়ে দিয়ে যায়, বেড়ালদের জন্য ছিটে ফোঁটাও রাখে না।

তাহলে আর আমাদের কী দোষ?

তোদের আর দোষ কি? টর্চ ফর্চ কিছু আছে সঙ্গে?

কিচ্ছু না।

তবেই হয়েছে। তবে এই অন্ধকারের গর্ভ থেকে কি করে আমরা বেরুব? মামার সকাতর কণ্ঠ। পিস্তল টিস্তল আছে? তাও নেই, টর্চও নেই—বাছারা এসেছেন গুপ্তধনের সন্ধানে। মামার হঠাৎ ভারী রাগ হয়ে যায়: ঢাল নেই তরোয়াল নেই, নিধিরাম সর্দ্দার। গুপ্তধন নেবেন? আবদার দ্যাখো না।

সেই সুচীভেদ্য অন্ধকারের মধ্যেই, কাউকে বলা যায় না, আস্পর্ধার সেই জাজ্জল্যমান দৃষ্টান্ত দুটিকে অঙ্গুলি নির্দেশে তিনি দেখাতে চান।

দেখতে চান বটে, কিন্তু নিজে তিনি দেখতে পান না। নিদর্শন দুটি কোথায় দাঁড়িয়ে আছে দর্শন পেলে এ দণ্ডেই এইসা এক চড় কসিয়ে মনের সমস্ত ঝাল মিটিয়ে নিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কার্পণ্য হতো না।

কেন, পিস্তল না থাকলে কী হয়? লিলি জানতে ব্যগ্র হয়ে ওঠে: পিস্তল থাকলে কী হতো মামা?

চাম চিকেরা এ অন্ধকারের মধ্যে কি রকম ফরফর করছে দেখছিসনে? না দেখলেও, শুনতে পাচ্ছিস তো? গায়ে মুখে এসে ঝাপটা লাগালেই হোলো। পিস্তল থাকলে এক্ষুনি ওদের ফরফরানি বন্ধ করে দেয়া যেত। একটি আওয়াজ করলেই—ব্যস। গুড়ুম শুনলেই দুদ্দার করে পালিয়ে যেত সব। দিগ্বিদিকে উধাও হয়ে যেত। গুড়ুমকে ভয় করে সবাই। ওর নাম আক্কেল গুড়ুম।

জানিষতো লিলি, ওরা ভারী চুল ছেঁটে নেয়, এই চামচিকেরা। মাথায় এসে ঝাপটালেই বুঝবি খানিকটা চুল খুবলে নিয়ে গেছে। শিশিরও উড্ডীয়মান ও দুরন্তদের বিরুদ্ধে অভিযোগ না এনে পারে না—নির্ঘাত নিয়েছে।

লিলি সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠে, মাথায় হাত চাপা দিয়ে নিজের কেশদাম রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়। খুবলে নিলেই হলো আর কি? চুলের দাম নেই? আঙুল ঢাকা দিয়ে চুল বাঁচিয়ে লিলি মামার বিশাল বগলের তলায় এসে মাথা বাঁচাতে চায়, এই অন্ধকারে ওই চক্রাকারে উড়ন্তদের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ ছাড়া আর কী উপায়?

এখান থেকে বেরুবার চেষ্টা করা যাক, এসো মামা। শিশির বলে: কিন্তু দরজাটা কোন দিকে, তোমার মনে আছে?

আরে তাই যদি মনে থাকবে তাহলে তো কোনকালে বেরিয়ে পড়তুম। তোদের জন্যে অপেক্ষা করতুম নাকি? এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াতুম না তাহলে। মামা বলেন: এই বিচ্ছিরি অন্ধকার আর ভ্যাপসা গন্ধের মধ্যে কি এক মিনিটও দাড়ানো যায়? কোনো ভদ্রলোক দাঁড়াতে পারে?

একটু থেমে মামা আবার বলেনঃ কেন, তোদের মনে নেই? তোরা তো এই এলি? পথ দেখে আসিস নি? এর মধ্যেই ভুল মেরে দিয়েছিস? এই মেমারি নিয়ে কি করে যে তোরা পরীক্ষা পাশ করবি তাই আমি ভাবি।

আমরা কি আর পথ দেখে এসেছি? আমি তো চুইংগামের চিহ্ন দেখতে দেখতে এলাম। শিশির জানায়।

আর আমি তো দাদাকে দেখতে দেখতে এসেচি। বিনা জিজ্ঞাসাতেই লিলি নিজের জবাব দিয়ে ছায়—আগে থেকেই।

মাথা কিনে নিয়েচ। এই জন্যেই না বলে যে যম জামাই ভাগনা তিন না হয় আপনা—মিথ্যে কথা বলে কি? ভেবে দেখলে, তিনটেই অপদার্থ।

বারে। তোমার নিজের বাড়ী। এর ঘর দোর রাস্তা সবই তোমার মুখস্থ—আর তাই যখন তোমার নিজেরই মনে নেই তখন আমরা তো আজকের ছেলে। আজকেই তো এই বাড়ীতে পা দিলুম? আমাদের মনে থাকবে?

আমার কি করে থাকে শুনি? মামার ঝাঁঝালো জবাবঃ এই ঘোরালো ঘরটা যে এই বাড়ীর ভেতরেই ছিল তাই আমি জানতাম না। প্ল্যান দেখে দেখে তো এলাম। তারপর যখন একমনে গুপ্তস্থানটা খুঁজে বার করছি তখন তোরা এসে গোলমাল বাধালি—তখনো হয়তো বার-পথের একটা আন্দাজ ছিল, তারপর সেই হতভাগা মামাটা এসে গুলিয়ে দিল। কতবার এগুলাম, কতবার পেছুলাম,—কতবার ঘুরপাক খেয়েছি—কিছু কি ছাই মনে আছে? তারপর এখন তো ঘুটঘুটি আঁধার। মামাটা আবার এমন বেয়াক্কেল যে টর্চটা পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে গেছে। ক্ষণেক থেমে আবার তাঁর আক্ষেপোক্তি হয়ঃ প্ল্যানটাও ছাড়েনি।

প্ল্যান নিলি, বেশ করলি। টর্চটা আবার নিতে গেলি কেন? লিলিও অনুযোগ করেঃ অন্ধকারে বেরুব কি করে সে হুঁশ নেই?

মামারা এমনিই বটে। মামা তার নিজের মামার নজির এনে নিজেদের জের টানেন। সেজন্য তুমি আফসোস কোরো না মামা। ওর খর্পর থেকে তোমার প্ল্যান আমি উদ্ধার করে আনব। তোমায় এনে দেব, তুমি দেখে নিয়ো—দুঃখ কোরো না তুমি। কেবল একবার ওর দেখা পেলেই হয়। শিশির ভরসা ছায়ঃ কিন্তু যাই বলো মামা তোমার মামাটি গ্র্যাণ্ড।

গ্র্যাণ্ড? কেন গ্র্যাণ্ড কেন? কিসের জন্যে গ্র্যাণ্ড—শুনি? মামা ভারী খাপ্পা হয়ে যান।

মামার মামা তো এমনিতেই গ্র্যাণ্ড মামা, তাই নয় কি? আপনা থেকেই তো গ্র্যাণ্ড? শিশির শুধরে নিতে চায়ঃ বাবার বাবারা যেমন গ্র্যাণ্ড ফাদার।

হুঁঃ, মামারা কক্ষণো গ্র্যাণ্ড হয় না! মামার মামা হলেও না। ভারী বদ হচ্ছে এই মামারা, আমি বলে দিতে পারি। মামা তৎক্ষণাৎ বলে দ্যানঃ ভাগনেদের চেয়ে কোন অংশে কিচ্ছু কম খারাপ নয়। বলে দিতে বিন্দুমাত্র তাঁর কুণ্ঠা হয় না।

মামার এই ব্যাখ্যানও বরং সহ্য হয় কিন্তু চামচিকেদের ঝড়ঝাপ কতক্ষণ সওয়া যায়? শিশির অস্থির হয়ে উঠল—যে করেই হোক, এই অন্ধকারের চক্রব্যূহ থেকে বার হতেই হবে। এই মুক্তির অভিযানে সে নেতৃত্ব পদ নেয়, লিলি তার অনুগামিনী হয় এবং মামাও শোক সম্বরণ করে তাদের পিছু নিতে দ্বিধা বোধ করেন না।

কিন্তু দরজা যে কোন্ ধারটায় তার হদিশ পাওয়া দায়। এ কোণে ধাক্কা খেয়ে ও কোণে ঢুঁ মেরে ইঁদুরদের দ্বারা তাড়িত হয়ে, দেয়ালদের দ্বারা প্রতারিত হয়ে, অবশেষে, একেবারে উঁচু শান-বাঁধানো একটু জায়গা পেয়ে হতাশায় ক্লান্ত হয়ে ওরা বসে পড়ে। শিশির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলেঃ না, এই গোলক ধাঁধা থেকে আজকে আর বার হওয়া যাবে না। রাত্রের মত এখানেই থাকতে হবে দেখছি।

তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন যে এ দশা হবে, আগে থেকেই আমি জানি। মামা গজগজ করেন।

জায়গাটা একটু উঁচু রয়েছে: শান বাঁধানোও আবার। ইঁদুররা এত দূর উঠতে পারবে না আমার ধারণা। আয় লিলি, শুয়ে পড়া যাক। গা গড়িয়ে জিরিয়ে নেয়া যাক একটু।

আমার চোখ জড়িয়ে আসছে দাদা। বসতে না বসতে তার ঘুম পায়—শুতে পেলেই সে বাঁচে।

ঘুমোতে পারিস। আমি পাহারায় জেগে থাকলাম। মামা তুমিও একটু ঘুমিয়ে নিতে পারো। কোনো ভয় নেই।

হ্যাঁ, ভয়ে তো আমি কাঠ হয়ে রয়েছি তা আর বলতে। বলতে বলতে মামা লম্বা হয়ে পড়েন। একটু পরেই তার নাক ডাকতে থাকে। লিলিরও নিশ্বাস ভারী হয়ে আসে।

শিশিরের চোখে ঘুম আসে না। শুয়ে শুয়ে জেগে জেগে আজকের সকাল থেকে এখন পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাটা আগাগোড়া সে ভাবে। প্ল্যান উদ্ধার থেকে প্ল্যান হারানো পর্যন্ত।......আর সেই জলজ্যান্ত লোকটার অদ্ভুত সব কাণ্ড কারখানা। থানার গায়ে লটকানো সেই পুরস্কার ঘোষণার নোটিশ। একটার পর একটা সমস্ত তার মানস পটে উদিত হতে থাকে।

পকেট থেকে বার করে মাঝে মাঝে চুইংগাম মুখস্থ করে আর কি করে দুর্ধর্ষ বক্কেশ্বর আইচের কাছ থেকে প্ল্যানটা পুনরুদ্ধার করবে, এই নিয়ে সে মাথা ঘামায়।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে হঠাৎ একটু খুট্। ইঁদুরাই হয়ত। শিশির আমল দ্যায় না। কিন্তু একটু পরেই আবার খট্ খটাখট্।

শিশিরকে উঠে বসতে হয়। ইঁদুরদের খটখটি তো এত জোর হবার কথা নয়। অন্য কারো নটখটি হবে। ভূত—ভূতরাই নাকি তবে?

শিশির সভয়ে অন্ধকারের চারিধারে ধারালো দৃষ্টি চালাতে

থাকে। এধার ওধার থেকে অন্ধকার ফুঁড়ে, কালো কালো ছায়া-মূর্তি উঁকি ঝুঁকি মারবে, হয়ত বা কঙ্কাল দেহীরা দেহি দেহি রবে এগিয়ে আসবে—পুনঃ পুনঃ তাদের হি-হি হাসি শুনতে পাবে হয়ত, এই রকমটা প্রতি মুহূর্তে সে প্রত্যাশা করে। কিন্তু না সেরকম কিছু দেখা যায় না, অবশ্য একটু আগে সে তন্দ্রার ঘোরে, তিনটি নর কঙ্কালকে করমর্দনের অভিপ্রায়ে এগিয়ে আসতে দেখেছিল কিন্তু চটকা তন্দ্রাটা ভেঙ্গে যেতেই চোখ মেলে ছাখে, সব ফাঁকা। ফাঁকি সব। কোথাও কিছু নেই।

কিন্তু তথাপি সেই খুট—খাট—খুটখুটনি বেড়েই চলে ক্রমশঃ—

খুট—খাট—খটাৎ। কার এইসব খুঁটি নাটি ? এবার যেন দূরে—অতি দূরে অন্ধকার বিদীর্ণ করে এক ফালি আলোর মতো কী যেন ঘোরা ফেরা করছে বলে বোধ হয়।

আলেয়া নয় তো ?

ভূতেরা—খুব সম্ভব মেয়ে ভূতেরাই—অনেক সময়ে আলেয়ার ছদ্মবেশে আসে বলে শিশিরের শোনা আছে। সে নড়ে চড়ে বসে। তার বুক দুরদুর করে। লিলির পায়ে পা ঠেকিয়ে ছুঁয়ে থাকে।

লিলির ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক হবে না, ভয় পেয়ে যাবে ছোট বোন—আর—আর মামার ঘুম ভাঙাতেও তার সাহসে কুলোয় না।

অন্ধকারের মধ্যে চোখ মেলে ভূতের কার্যকলাপ লক্ষ্য করে। সেই ভৌতিক আলোটা এবার এগিয়ে আসে। এসে এক জায়গায় থামে, চারধারে কি যেন খুঁজে ফেরে। এগোয়, একটু এগোয়, আবার থামে। অবশেষে একটা দেওয়ালের গা ঘেঁষে এসে দাঁড়ায়।

দেওয়ালে ধাক্কা খাওয়া আলোর প্রতিচ্ছায়ার চার ধারের আশপাশ ঈষৎ যেন আভাময় হয়ে ওঠে। তার আবছায়ার আলোর আড়ালে ছায়া মূর্তিটিকে এবার দেখা যায়। ছায়া মূর্তি হাত-পা নড়া, বেশ স্পষ্ট করেই শিশিরের চোখে পড়ে এবার।

শিশিরের কৌতূহল এবার তার ভয়কেও ছাপিয়ে ওঠে।

আলো হাতে এ আবার কিরকম ভূত রে বাবা? ভূত কিম্বা ভূতের ছদ্মবেশে অন্য কোনো গুপ্ত রত্ন-সন্ধানী? খোদার ওপর খোদ-কারী করা গুপ্তধনের অভিলাষী দুঃসাহসিক আর কেউ?

জানবার অভিপ্রায়ে, (এবং বাধাদানের মতলবেও) শিশির মুখের চুইংগামটা বার করে সেই ছায়ামূর্তিটিকে ছুঁড়ে মারে।

গায়ে লাগতেই ছায়ামূর্তিটি চেঁচিয়ে ওঠে: ইস্। এ আবার কিরে বাবা? কোত্থেকে এল? য়্যাঁ? কোনো ভূতুড়ে কাণ্ড নাকি?

ছায়ামূর্তিটা বিচলিত হয়। শিশির আরেকটা চুইংগামকে রসায়িত করে কসে লাগায়।

ইস্। কী এগুলো। ভারী ল্যাটপ্যাটি করছে। টেনে ছাড়ানো যায় না—কীরে বাবা। চটচটে দেখছি আবার।

ছায়ামূর্তিটি আপন মনেই মন্তব্য করে।

শিশির ক্ষান্ত হয় না, একটার পর একটা, অশ্রান্তভাবে লাগাতে থাকে।

ছায়া মূর্তিটি ভারী বিব্রত হয়ে পড়ে। এগুলো গায়ে লাগে, পেছুলে পায়ে লাগে, কী করবে ভেবে পায় না।

তারও পরে যা চটচেট। চটাচটি করেও ছাড়ানো যায় না। ভারী মুশকিলে পড়ে যায় বেচারী। অথচ কোত্থেকে যে ওই সব চট্যোপাধ্যায়রা আসছে, চটপট এসে পড়ছে, কিছুই বুঝতে পারে না।

যেখানেই পা ফ্যালে, চুইংগামে আটকায়—পা তোলা, এবং তুলে পুনরায় ফেলা, দুরুহ হয়ে পড়ে—যেদিকেই এগোয় পা আটকাতে আটকাতে চলে। অগত্যা এক পা তুলে ছায়া মূর্তিটি খানিক্ষণ ভাবে—(এক পা-ই তুলে রাখে, যতটুকু বাঁচোয়া। দু-পা তো একসঙ্গে তোলা যায় না।)—তারপর সুদীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলে ওঠে: বুঝেছি। এ হচ্ছে যখের ধন। যক্ষেরা সব

আগলাচ্ছে একে। রাত্তি বেলা ওদের চোখের সামনে থেকে এ চীজ বাগানো যাবে না।—ইস্! এবার একটা আমার নাকের ওপর এসে লেগেছে। যখন নাকে লেগেছে তখন আর না। নাক নিয়ে পালানো যাক।

এই বলে' আরো আক্রমণের অপেক্ষা না রেখে তুপ দাপ করে অন্ধকারের মধ্যেই সে চোঁ চাঁ দৌড় মারে।

।। ছাগলের রাজপথ পেরিয়ে ।।

যে রকমটা ভাবা গেছল শিশির যেটি আশা করেছিল, তাই ঘটে রয়েছে দেখা গেল। রাতারাতি এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

এ রকম দৈব সহায় না থাকলে বড় বড় ডিটেকটিভকেও হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। এ জাতীয় আশ্চর্য যোগাযোগ ঘটে বলেই শার্লক হোমস, রবার্ট ব্লেক, শিশির প্রভৃতি গোয়েন্দারা সুবিধা করে নেয়। পদে পদে বিপদ হানা দিয়েও কিছুই করতে পারে না—যৎপরোনাস্তি বাধা পেয়েও শেষমেষ তারা কার্যোদ্ধার করে বসে।

স্বয়ং প্রকৃতিই ওদের—ওই বদমাসদের বিরুদ্ধে। ওদের নিজেদের প্রকৃতি নয়—বাইরের বিশ্ব প্রকৃতির কথাই বলা হচ্ছে।

তাই ইতিমধ্যে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে এবং শিশির অন্ধকার ব্যূহ থেকে বার হবার মাত্রই দেখল হ্যাঁ, যেমনটি তার প্রত্যাশা ছিল তাই বটে। বৃষ্টিও হয়েছে এবং তার ফলে ভেজা মাটির ওপরে বেশ গভীর হয়ে কার যেন পায়ের দাগ চেপে বসেছে।

পৃথিবীর ছোট বড় মেজ সেজ সব ডিটেকটিভ যে সুবিধা পেয়েছে, বরাবর পেয়েও আসছে, শিশিরও যদি তার ওপর নির্ভরতা পোষণ করে থাকে বিশেষ অন্যায় কিছু করেনি। এবং প্রকৃতিও যদি তার উপযুক্ত কাজ করে থাকে, কিছু অন্যায় হয় না। এ

স্থলে প্রকৃতি শিশিরের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেনি—প্রকৃতি বিরুদ্ধ আচরণ করেন নি কিছু।

এবং সেই পায়ের দাগ, মোটা মোটা পায়ের গোদা ছাপ চলে গেছে—তাদের বাড়ীর আনাচ পেরিয়ে, পাশের বাগানের কানাচ ঘেষে—সেই দাগরাজি, পথে সেই দাগী পৃষ্ঠটি বরাবর চলে গেছে—

কোথায় গেছে, সেটাই তো শিশিরের এখন আবিষ্কার্য—তা ছাড়া আর কী ?

শিশির মাথা নেড়ে মুখ নেড়ে তার মামাকে জানিয়ে দিয়েছে ঃ কাল রাত্রে যে এসেছিল সে তোমার মামাই বটে। তোমার মামা ছাড়া আর কেউ নয় মামা।

বাঃ মামাই তো! মামা ছাড়া আবার কে হতে যাবে। ব্রজেশ্বর বিকৃত মুখে জবাব দিয়েছেন ঃ মামাই তো আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিলে প্ল্যানটা; নইলে আর কোনো মিঞার সাধ্য ছিল না।

উঁহু, তার পরেও ফের আবার এসেছিল যে।

ফের এসেছিল ? তুই কি স্বপ্ন দেখছিলি নাকি ?

ব্রজেশ্বর এবার একটু বিস্মিত হন ঃ ফের আবার কে আসবে! ফের কেন আসতে যাবে শুনি ? প্ল্যান তো সে আগেই নিয়েছে—নিয়ে গেছে—এই হাত থেকেই হাতিয়ে নিয়ে ভেগেছে। তবে ?

শিশির সে কথার জবাব ছায় শুধু না বলে ঃ এবার তুমি নিশ্চিত হতে পারো মামা। আর চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তোমার প্ল্যান যদি না আমি উদ্ধার করে আনি তো কি বলছি। সন্ধ্যের মধ্যেই এনে দিচ্ছি তোমায়।

হ্যাঁ, সে প্ল্যান আর উদ্ধার করতে হয় না। ব্রজেশ্বর অবিশ্বাসের হাসি হাসেন ঃ আমার মামাকে তুই তো চিনিস না। আমি চিনি। মামাদের খর্পর থেকে জিনিষ বাগানো সহজ নয়।

আমার তো আর মামা না। আমি পারব। শিশিরের সুদৃঢ় আস্থা।

মামার মামা—সে আরো বড়ো কঠিন ঠাঁইরে। বলে আমি যাই সেয়ানা তাই পেরে উঠলুম না পেয়েও হারালুম—আর তুই তো কালকের ছেলে, সামান্য ভাগনে—ভাগনের ভাগনে মাত্র, তুই পারবি। হ্যাঁ, থাকতো যদি আমার মামার মামা—পারত সে। কিন্তু—কিন্তু সে—সে কোথায়?

আকাশের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে ব্রজেশ্বর দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জন দ্যান। পারি কি না পারি দেখে নিয়ো। লিলিকে সাথে নিয়ে এই আমি পা বাড়াচ্ছি। উদাহরণ স্বরূপ, তক্ষণি তক্ষুণি শিশির পাড়ি দ্যায়, মামার বাড়ীর প্রাতরাশের জন্যেও প্রতীক্ষা করে না।

মাতুলালয়ের পাশ ধরে, বাগানের ধার ঘেঁষে ভিজে মাটির তাজা পায়ের দাগ লক্ষ্য করে শিশিররা এগিয়ে চলে। আরো সব কত বাড়ীর গা ঘেঁষে, অনেকখানি পথ বেয়ে, আরেকটা বাগানের ভেতর দিয়ে অনেক দূর ওরা চলে যায়। যেতে যেতে শহরের সীমান্তে গিয়ে ওরা পৌঁছায়।

এবং তখনো—তখনো ওদের চোখে পড়ে—সেই পায়ের দাগ। সেই শ্রীপাদপদ্ম রেখা আরো—আরো দূরে চলে গেছে।

যাক, তাতে ওদের দুঃখ নেই। কেবল চিহ্ন রেখে গেলেই হোলো। পথে একটা রেস্তরাঁয় সামান্য কিছু ওরা খেয়ে নিয়েছে —এখন পদচিহ্নের পথ ধরে—ও পদাঙ্ক অনুসরণ করে—যদি পৃথিবীর অপর প্রান্তেও যেতে হয় তাতেও ওদের আপত্তি নেই। আর এই পায়াভারী ভদ্রলোক—পায়ের দাগের দাগী আসামী যেখানেই যান না কেন, যত দূরেই যান না, তাঁরও আর নিস্তার নেই ওদের হাতে—শেষ অবধি যদি তিনি পা বজায় রেখে গিয়ে থাকেন—পা তাঁর ক্ষয়ে গিয়ে কিম্বা খোয়া না গিয়ে থাকে তা হলে তাঁকে ওরা পাকড়াও করবেই। নিশ্চয়ই।

এ ধারটায় ভারী ছাগলের আমদানি দেখা যাচ্ছে। শিশির অদূরবর্তী অবশ্যম্ভাবী এক পাল ছাগলের দিকে লিলির দৃষ্টি টানে।

আমরা শহরের বাইরে এসে পড়েছি দাদা। আসন্ন ছাগ পালের দিকে তাকিয়ে লিলি বলে : কি রকম মেঠো মেঠো এ ধারটা দেখচ না।

হ্যাঁ, মাঠে চরাতে নিয়ে যাচ্ছে ছাগলদের। একটু তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চ, আমরা পেরুবার আগে ওরা যদি এসে পড়ে তা হলেই পায়ের দফা রফা। সব ওরা নিজের পায়ের খুরে কামিয়ে দিয়ে যাবে।

ও বাবা! কতো ছাগল! একশো—দুশো—তিনশো—না তারও বেশী? ছাগ—সম্প্রদায়ের সেন্সাস নেবার লিলির আগ্রহ দেখা যায়।

এক হাজারের কম না। চ' চ'—চ' বলছি—কিন্তু বলতে বলতে ছাগলের পাল এসে পড়ল। বাঁ ধারের মাঠ থেকে, রাস্তা ডিঙ্গিয়ে ডান দিকের মাঠে গিয়ে পড়তে লাগলো তারা—এই পারাপারের মুখে বিস্তর ছাগল দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে, মাঠে না থেমে, রাস্তার দু' দিকে রওনা দিতে চেষ্টা করল। তাদের এই উন্মার্গযাত্রায় নেতাদের পক্ষ থেকে বাধা ছিলই—পালের সাথে লাঠি হাতে কতগুলি রাখাল রয়েছে দেখা গেল—তাদের দ্বারা পুনঃ পুনঃ বাধা পেয়ে ব্যহত হয়ে অবশেষে তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে।

রাখালদের যেমন হৈ-হুল্লা, ছাগলদের তেমনি চ্যাঁ-ভ্যাঁ—সমস্ত মিলিয়ে কিছুক্ষণ ধরে এমন এক বিপর্যয় বেধে গেল আর চারধার দিয়ে সেই উন্মত্ত ছাগস্রোত যেভাবে অট্টরোল করে ছুটে চলল, তাতে পাছে সেই ক্ষুরধার জনতার পায়ের তলায় নিজেরাই না শেষটায় চিহ্নমাত্রে পর্যবসিত হয়ে যায়, সেই ভয়ে শিশির আর লিলি একটা উঁচু পাথরের ঢিপির ওপর আশ্রয় নিতে বাধ্য হোলো।

যতক্ষণ না শেষ ছাগলটি ত্রিসীমানা থেকে নির্বিঘ্নে অন্তর্হিত হয়েছে —ততক্ষণ তারা সেই ঢিবির ওপর থেকে নামল না।

দেখলি তো। সব পণ্ড। কোথায় আর পায়ের দাগ? বেবাক চারধারে ক্ষুর বোলানো। শিশির আফসোস করে।

চলো একটু এগিয়ে দেখা যাক। লিলি আশার বাণী শোনায় ঘুরে ফিরে দেখাই যাক না।

পায়ের দাগ যখন নেই তখন আর না হোক ঘুরে লাভ? কোন সত্যিকার ডিটেকটিভ এমন বাজে কাজ করে না। চ, ফেরা যাক—মামাকে মুখ দেখাবো কি করে তাই আমি ভাবছি।

আমার ভারী জল তেষ্টা পেয়েছে দাদা। লিলি বলে। আশার বাণী পরেই তার মুখে তৃষ্ণার বারতা।

সামনেই ঐ ছোট্ট বাড়ীটাতে গিয়ে জল চাওয়া যাক। শিশির লিলিকে নিয়ে এগোয়—খুব দূরে নয় বোধ হয়।

খুব দূর বোধ না হলেও ছোট্ট বাড়ীটা বেশ একটু দূরেই। ও ধারটা পাহাড়ের ঢালুর থেকে আস্তে আস্তে উঠে গেছে, সেই জন্যে আপাতদৃষ্টিতে যতটা মনোরম আর সন্নিকট বলে মনে হয় সামনের বাড়ীটা তত কাছাকাছি নয়।

উপত্যকা উতরে, চড়াই বেয়ে ওরা বাড়ীর নিকটে গিয়ে পৌছয়, সটান ভেতরে গিয়ে চড়াও হয়। কিন্তু বাড়ীর কোথাও এতটুকু শব্দ নেই, জনপ্রাণী আছে বলে মনে হয় না।

পা টিপে টিপে ওরা এগিয়ে যায়। একটু ভয়েই এগোয় সামনের ঘরটা থেকে হঠাৎ চাপা গলায় ফিসফাস—ওদের কানে আসে ঃ পিস্তলগুলোয় গুলি ভরে নিয়েছ তো?

পিস্তলের কথা কানে যেতেই তার একটা গুলি যেন ছিটকে এসে ওদের মর্মস্থল বিদ্ধ করে। য়্যা? এখানেও পিস্তল? সেই পিস্তল আবার এখানেও? ছাগলের রাজধানী পার হয়ে এসেও ফের পিস্তল?

একটা আধ বোঁজা জানালার ধার ঘেঁষে ওরা দাঁড়ায়। দেয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়ে। গরাদের ফাঁক দিয়ে সন্ত্রস্ত দৃষ্টি বাড়িয়ে ভেতরের দিকে উঁকি মেরে ছাখে, চৌকোণো একটা টেবিল ঘিরে জন পাঁচেক ভীষণ চেহারার মানুষ, টেবিলের ওপর ছড়ানো কী একটা কাগজের ওপরে ব্যগ্র হয়ে ঝুঁকে পড়েছে সেই পঞ্চপাণ্ডবের একজন দর্শক মাত্রই চেনা যায়, তিনি হচ্ছেন আর কেউ না তাদের সেই গ্র্যাণ্ড মামা।

॥ বেড়ালের ছদ্মবেশে ডিটেকটিভ ॥

টেবিলের ওপর শায়িত সেই কাগজখানাও আর কিছু না, দূর থেকে কটাক্ষ করেই তারা বুঝতে পারে, সেই মোক্ষম প্ল্যান। মামার ওপর টেক্কা মেরে, কেড়ে নিয়ে আসা গুপ্তধন আবিষ্কারের নির্ঘাত সেই নকশা।

শিশির লোলুপনেত্রে প্ল্যানটার দিকে তাকায় আর লিলির কানে কানে জানায়ঃ লোকগুলো কোনো কারণে একবার এঘর থেকে সরলে হয়। আমি টেবিলের ওপর ছোঁ মেরে ওটা নিয়ে আসি। আমি ভাবছি ওদের কেউ যদি আবার এই বাইরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে আসে—।

লিলি তার ভয়াবহ ব্যক্ত করেঃ বেরুবার চেষ্টা পায় যদি—? তাহলে ভাবনার কথা বটে। ঘাড় নাড়ে শিশির। একটু ভাবনার কথাই বইকি।

বাস্তবিক, এদিকটা ওর চোখে পড়ে নি, পালাবার পথ, পরিষ্কার রেখে তবে এগুবার দিকে ঝোঁক দিতে হয়—তা নইলে দুঃসাহসিকদের জীবনে আর দ্বিতীয়বার জয়যাত্রার অভিযানে বেরুবার সুযোগ আসে না—সেই প্রথম মহা যাত্রাতেই তাঁরা তলিয়ে যান।

কোথ্ দিয়ে পালাবো আমরা? লিলির মুখে সেই জিজ্ঞাসা—মহা মহা বীর শ্রেষ্ঠদের জীবনের যা প্রথম ও শেষ প্রশ্ন।

পালাব কেন? প্ল্যান না নিয়েই পালাবো? শিশিরের মৃদু আপত্তি: প্রাণ দিয়ে যেতে হয় তাতেও রাজী কিন্তু প্ল্যান না নিয়ে এক পাও নড়ছি নে।

তাদের জানালাটার পরবর্তী জানালায় ঠেসানো এক গাদা প্যাকিং বাক্স খাড়া করা ছিল—সেই কাঠের বাক্সগুলোর চূড়ায় বসে একটা বেড়াল ঝিমুচ্ছিল বলেই মনে হয়।

আমরা ছদ্মবেশে এলেই পারতাম। বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে লিলি জবাব দ্যায়: ভালো হতো তাহলে।

তুই কি বলতে চাস আরেক জন ছদ্মবেশে এখানে এসেছে? শিশিরের অনুসন্ধিৎসু কণ্ঠ: ওই বেড়ালের ছদ্মবেশেও কি অপর কোনো ডিটেকটিভ।

শিশির লিলির দৃষ্টি অনুসরণ করে সন্দিগ্ধ নেত্রে বেড়ালটার দিকে তাকায়।

শিশিরের প্রশ্নে লিলি ভালো করে লক্ষ্য করে এবার। বেড়াল-টার হাবভাব কেমন যেন। ঘুমোনাটা যে ওর ফাঁকি তা—বেশ বোঝা যাচ্ছে। ঝিমুনোর ফাঁকে ফাঁকে দেখচ না ও মাঝে মাঝে চার ধারে বেশ—চোখ বুলিয়ে নিচ্ছে। আর চেয়ে দ্যাখো দাদা, ওরও নজর এই ঘরটার ভেতরে।

দেখছি। শিশির গম্ভীর গলায় বলে। অনেকক্ষণ আগেই দেখেছি।

কিন্তু তাহলেও ওকে বেড়াল ছাড়া আর কিছু বলে আমার মনে হয় না। লিলি তার তদন্ত-কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট দাখিল করে।

আমারও তাই মনে হয়। আপাত দৃষ্টিতে তাই মনে হয় বটে। তাছাড়া একটা ব্যাপারে দুটো গোয়েন্দা লাগা ঠিক হবে কি? আর তা লাগেও না কখনো। কিন্তু আমরা ওই বাক্সগুলোর

আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালে কেমন হয়? ওখান থেকে ঘরটার ভেতরেও নজর রাখা যায় আর বেশ লুকিয়েও থাকা যায়।

এ প্রস্তাব সমীচীন বলে মনে হয় শিশিরের। তারা দুইজনে সেই প্যাকিং বাক্সগুলোর আবডালে গিয়ে খাড়া হয়।

বেশীক্ষণ ওদের দণ্ডায়মান থাকতে হয় না। তপস্যা বড়ই কি আর ছোটই কি? বর লাভ তাতে অব্যর্থ। অচিরেই তাদের অভিষ্ট সিদ্ধি হয়। নিজেদের রিভলবার বের করে খুব সম্ভব ভরাট করবার মতলবেই ওরা পাশের ঘরে যায়। সেই পার্চমেণ্ট কাগজের প্ল্যানটিকে টেবিলের ওপরে অসহায় অবস্থায় ফেলে রেখেই চলে যায় ওরা।

লিলি, এই আমাদের সুবর্ণ সুযোগ। দাঁড়া তুই।

শিশির সেই জনবিরল ঘরে একক এগিয়ে আগে টেবিলটা হস্তগত করে—তার পরে প্ল্যানটাও ঠিক বাগিয়ে নিয়েছে—এমন সময়ে অঘটন আর কাকে বলে?

শিশিরের আকস্মিক গৃহ প্রবেশে বেড়ালটা ততটা বিচলিত হয় নি, একটা চোঁখ খোলা এবং আরেকটা বোঁঝা রেখেই, নিরুদ্বেগে ওর কার্য কলাপ লক্ষ্য করছিল, কিন্তু টেবিলের ওপরে শিশিরের হস্তক্ষেপ দেখবা মাত্রই তার ভাবান্তর ঘটল এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারী বিপর্যয় ঘটে গেল। প্যাকিং বাক্সের মাথা থেকে সে এক লাফ মারল—ঠিক লিলির মাথায় নয়—লিলির মাথা বাঁচিয়ে জানালার গোড়াতেই লাফটা দিল, কিন্তু তার এই কক্ষ—পরিবর্তনের তৎপরতায় —ধূমকেতুরা যেমন সুযোগ পেলেই সমাদরে পৃথিবীর ওপরে ল্যাজ বুলিয়ে দিয়ে যায়—সেও তেমনি লিলির মুখের ওপর নিজের ল্যাজটা বুলিয়ে নিয়ে গেল।

লিলি হাঁউ মাঁউ করে উঠল। এবং তার কেবল ওই চিৎকার ছাড়াই নয়—সেইসঙ্গে চতুর্দিকে এমন হাত পা ছুঁড়ল যে তার প্রতিক্রিয়ায় উঁচু করে খাড়া করা সমস্ত প্যাকিং বাক্সগুলা যেন

অকস্মাৎ ভূমিকম্প, ভয়ানক শব্দে একটার পর একটা এবং সবগুলো পিঠোপিঠি ধুপধাপ করে পড়তে শুরু করল।

কেবল হাঁউ মাঁউ মানুষের গন্ধ পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট ছিল, তার ওপরে মানুষের শব্দ কানে যেতেই অন্য ঘরে রাক্ষসদের টনক নড়ল।

শিশির অবশ্যি ততক্ষণে খসড়াটা হাতিয়ে বেগে বেরিয়ে আসতে পেরেছে। বার হয়েই, লিলিকে সেই পতিত এবং পতনোন্মুখ প্যাকিং বাক্সদের কবল থেকে হ্যাঁচকায় উদ্ধার করে তিন লাফে পগার পারের দিকেই ছুটছিল। কিন্তু এদিকেও তখন গ্র্যাণ্ড মামার দল প্যাকিং বাক্সদের আর্তনাদ শুনে পিস্তলদের ভর্তি করে মার মার শব্দে হুদ্দাড় করে বেরিয়ে পড়েছেন।

ঐ—ঐ পালালো। প্ল্যান নিয়ে পালালো ঐ—গ্র্যাণ্ড মামা নিজেরাই এবার আর্তনাদ করে উঠলেন!

অমনি সবার পিস্তল থেকে তাদের উদ্দেশ্যে ঝমাঝম গুলি বৃষ্টি শুরু হয়। কিন্তু হলে কি হবে, ততক্ষণে তারা রিভলবার রেঞ্জের বাইরে।

দেখছ কি! বন্দুক নিয়ে এসো। পালালো যে—পিস্তল হাতে ভ্যাবা গঙ্গারামের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছ কি সব? বক্রেশ্বর আইচ চীৎকার করে ওঠেন।

দেখতে দেখতে বন্দুক এসে পড়ে।

দুড়ুম—দুড়ুম—দুম। বন্দুকরা গর্জন করে ওঠে। একাদিক্রমে এবং এক সঙ্গে দুমদাম লাগায়।

লিলি, ঘাবড়াস নে। বন্দুকে আমাদের ভয় নেই। দৌড়তে দৌড়তে ছোট বোনকে আশ্বাস দেয় শিশির। ওসব গুলি আমাদের কানের আশপাশ দিয়ে চলে যাবে। ছোঁবেও না আমাদের, তুই দেখে নিস। কেন, অ্যাডভেঞ্চারের বইয়ে তুই পড়িস নি?

হুম, লিলি শুধু বলে। লম্বা লম্বা পা ফেলতে ফেলতে লম্বা লম্বা কথা বলা যায় না। শিশিরের কথা মিথ্যে নয়—বন্দুকের ঐ তুড়ুম দুড়ুম আওয়াজই সার। ওদের আগ পাশ তলায় কোথাও লাগা দূরে থাক—এক নম্বরের স্ফূর্তিবাজের মত—গুলিগুলো ওদের আশপাশ ঘেঁষে শীস দিতে দিতে চলে যায়।—শিশিরের সীমান্ত কি লিলির সীমন্ত—কোথাও ছোঁয় না। ওদের স্বরূপ ব্যবহারে শিশির বিস্মিত হয় না একটুও।

গুলির উপদ্রব শেষ হলে দুজনে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে হাঁপ ছাড়ে। শ্বাস-প্রশ্বাসের স্বাভাবিকতা ফিরে পাবার পর লিলি বলে ঃ বুঝেছ দাদা, সেই বেড়ালটাই নষ্টের গোড়া। সেই আমাদের ধরিয়ে দিলে। প্যাকিং বাক্সগুলোও ফেললে ও তো।

হুঁ, এখন আমার বোধ হচ্ছে বেড়ালটা খুব সুবিধের ছিল না। শিশির মাথা নাড়ে ঃ আসলে বেড়ালই ছিল কি না কে জানে।

তোমার কি ধারণা তাহলে কোন ডিটেকটিভ ? পুনরায় ওদের পুরনো সন্দেহোদ্রেক ঃ ছদ্মবেশী গোয়েন্দা কোনো ?

আমার তাই বিশ্বাস। আমি প্ল্যানটায় হাত দেবার সাথে সাথে ও লাফ মেরেছিল।

এখন আমার বেশ মনে পড়ছে।

আমাকে এমন একটা ল্যাজের ঝাপটা লাগালো যে—। লিলি নিজের নাকে হাত বুলায় ঃ যদিও ওটা ওর সত্যিকার ল্যাজ নয় নিশ্চয়। অনেকটা পরচুলার মতো ল্যাজের ব্যাপার যদিও, কিন্তু তবু ভাবতেই এখনো আমার গা শির শির করছে।

ও লোকটা একটা পাকা ডিটেকটিভ। উঃ, কি রকম নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে। আর কী তীব্র লক্ষ্য। আমার কার্যকলাপের ওপর কি রকম আশ্চর্য নজর রেখেছিল। দেখেছিলি ? এ রকম প্রায় দেখা যায় না। ভাবতেও পারা যায় না। শিশির বলে ঃ

কিন্তু ডিটেকটিভ হলেও ওদের দিকের ডিটেকটিভ—ডিটেকটিভের ওপরে ডিটেকটিভ।

এমন সময় দূরে: ভৌ—ভৌ—ভৌ—ঔ-ঔ-ঔ-ঔ-ঔ—। একাধিক কুকুরের সমবেত ঐক্যতান এক সাথে শোনা গেল।

শিশির ব্যস্ত হয়ে ওঠে: দৌড় দৌড়। ডালকুত্তাদের ছেড়ে দিয়েছে, দেখছিস কি। গন্ধ শুকে শুকে আমাদের পিছু পিছু ওরা ছুটে আসবে। হাতে পাওয়া মাত্রই ছিঁড়ে খুঁড়ে ফেলবে আমাদের—ভারী ভয়ানক এই সব ডালকুত্তারা।

এবং বলতে না বলতে—

॥ শিশিরের লম্ফ ঝম্ফ ॥

ভৌ—ভৌ—ভোঁ-ভৌ—ভো—ও-ও-ও ও-ঔ।

সেই ডালকুত্তার দল ভয়ানক হৈ চৈ করে এগিয়ে আসতে লাগল। এবং সঙ্গে সঙ্গে শিশির আর লিলির আবার ভোঁ দৌড়। জানিস লিলি, যে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে সে কুকুর নাকি কামড়ায় না। দৌড়তে দৌড়তে শিশির জানায়।

লিলি এ সম্বন্ধে কিছু বলতে পারে না।

এসব ডালকুত্তারা কামড়াবে কি না কে জানে। শিশির বলে। দৌড়তে দৌড়তেই সন্দেহটা ব্যক্ত করে, দাঁড়িয়ে পরখ করে দেখার তার সাহস হয় না।

কুকুরদের মধ্যে যারা বাক পটু, বিবৃতি দিতে বিশারদ, কামড়াবার তাদের উৎসাহ কম, একথা অনেক দিনকার জানা কথা। কিন্তু সে কথা কাজের কথা কিনা, রচনার খাতায় ছাড়া আর কোথাও কাজে লাগানো যায় কিনা, এক সঙ্কটাপন্ন সুযোগ পরীক্ষা করে দেখতে তাঁদের ভরসা হয় না।

এরাও এই সব কুকুররাও বক্তৃতা ছড়াতে ছড়াতে ইস্তাহার বিলি করতে করতেই আসছে বটে কিন্তু এদের মুখের কথায় কি আস্থা স্থাপন করা যায় ? এরা যদি ততটা ভদ্রলোক না হয় ?

তুই কি বলিস লিলি ? এই সব কুকুরদের—?

এদের অভিভাষণে বিশ্বাস করা যায় কি যায় না, এই কথাটাই শিশির জানতে চায়।

লিলি কিছুই বলে না, বলবার তার শক্তি নেই, কিম্বা এ বলা বাহুল্য মাত্র এই হয়ত তার বক্তব্য। সে আরো জোরে জোরে পা চালাবার চেষ্টা করে, যা বলবার মুখে না বলে পায়ের সম্মুখেই ব্যক্ত করতে চায় বোধ হয়।

উঁহু, যেরকম ধারা চেচাচ্ছে, এরা যেন কামড়ে দেবে বলেই মনে হয়। এ সব ডালকুত্তাদের কাছে ডাল গলানো যাবে না। লিলির মতে অপেক্ষা না রেখেই শিশির নিজের আস্থা জ্ঞাপন করে।

আর কামড়াতে আরম্ভ করলে—শুরু করলে একবার—বাঃ বাঃ—

সেই ভয়াবহতা শিশির ভাষায় ফুটিয়ে তুলতে পারে না, তার মানসনেত্রের সামনে সমুজ্জল হয়ে প্রকাশ পায়, তার প্রতি পদক্ষেপে, দ্রুত গতির সঙ্গে তাল রেখে সেই একান্ত আসন্ন দুর্ঘটনা সিনেমা ফিলমের মতো দৃশ্যের পর দৃশ্য উদঘাটিত হয়ে প্রকট হতে থাকে.......

এক ডজন বুভুক্ষু ডালকুত্তা খাই খাই করতে করতে তাদের দুজনের ঘাড়ে এসে পড়েছে—ছ জন করে পার হেড—ভালো করে—খতিয়ে হিসেব করলে তিন জন করে পার লেগ—কেননা হাতের নাগালে পাওয়া মাত্রই ওরা পায়ে এসেই কামড়ে বসবে, পলায়নের যন্ত্রটাকেই ধ্বংস করবে সব আগে—পা থেকেই উদরস্থ করতে শুরু করবে। তারপর পা থেকে হাতে—হাত থেকে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। নাক কান চোখ মুখও তারা বাদ দেবে না, অবহেলা করবে না নিশ্চয়, তাদেরকেও ছিঁড়ে খুঁড়ে খুবলে খাবলে পেটের মধ্যে পাচার করে দেবে সন্দেহ নেই কিন্তু ওগুলো তারা

খুব সম্ভব, শেষের দিকে চাটনি কিম্বা সন্দেশের মত আস্তে আস্তে তারিয়ে তারিয়েই খাবে—ভোজনের প্রোগ্রামটা খাদ্য পরম্পরা এই ভাবে অগ্রসর হয়ে পরিসমাপ্তিতে গিয়ে পৌঁছানো উচিত তবে আহার্য-বস্তুর অগ্রপশ্চাৎ সম্বন্ধে ডালকুত্তাদের কতটা বাচ বিচার, খাদ্য দ্রব্যের চর্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিভেদে কার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা বিধেয়—এই বিষয়ে কতখানি ওদের কর্তব্যজ্ঞান ও বোধ শক্তি এবং সুরুচি বা সৌখিন তারই বা কদ্দূর দৌড় তার কোনই ধারণা শিশিরের নেই। হয়তো ওরা প্রথমেই এসে, উঁচু দেখে, শিশিরের নাশিকাতেই ঘেউ করে এক কামড় দেবে, প্রথম দর্শনেই সাবড়ে দেবে এক কামড়ে—ঠিক আচারের মতো তার প্রতি আচরণ করবে কি না কে জানে।

কিন্তু কতক্ষণেরই বা ভাবনা? ওদের দুজনকে পিকনিক করে ফেলতে বারো জনার পক্ষে আর কতক্ষণ?

তারপর আহার সমাধা করে বিজয়গর্বে ওরা ফিরে যাবে—প্রত্যেকে এক একখানা হাড় মুখে করে—ওদের দুইভাই বোনের ভগ্নাবশেষ। ওদের চোখে দীপ্ত চাহনি, এবং হয়ত বা মুখের কোণে একটু মুচকি হাসি।

তখন নিঃশব্দে ওরা ফিরে চলেছে—যদিচ তখনো ওদের মুখে বিবৃতি—সে হাড়। সিনেমার একেবারে সীমানায় এসে The End কল্পনা করতেই শিশিরের রোমাঞ্চ হয়।

ডালকুত্তারা তখন খুব কাছাকাছি এসে পৌঁচেছে—তাদের হাঁক ডাক প্রায় ওদের কান ধরে টান লাগাচ্ছে বলতে গেলে।

ভৌ—ভৌ—ভৌ।

সংস্কৃত ভাষায় ওর মানে দাঁড়ায়: ভো ভো। ওহে—তোমরা অত দৌড়াচ্ছ কেন? আরে শোনো শোনো। একটু দাঁড়িয়ে যেতে কি হয়?

শিশিরের সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ খেলে যায়। সে তড়াক করে এক লাফ মারে—

নিজে লাফিয়ে উঠে, তারপরে লিলিকে টেনে তুলে নেয়।

॥ কুকুর আর মুগুর ॥

উঁচু রোয়াক ও ফলা ছোট একখানি ঘর। তাদের জন্যেই পথের ধারে অপেক্ষা করছিল যেন। একখানিই মাত্র ঘর, গৃহস্বামী কেউ নেই হয়তো কোনো কাজেই—।

কোথাও বেড়িয়ে থাকবেন—তা যেখানে খুশি তিনি যান তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার, শিশির লাফিয়ে উঠেছে। একলাফে আগে নিজে উঠে, তারপর লিলিকেও সে টেনে তুলে নিয়েছে।

উঃ। বাঁচা গেল এতক্ষণে। ঘরে ঢুকে খিল এটে দেয়া যাক এবার। দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে পদার্পণ করতে করতে সে বলে।

লিলি শুধু বলেঃ উঃ। সে দম ছাড়ছে তখন। অবশ্যি, বাঁচা যেতই। মারা যেতুম না অবশ্যি। হাঁপ ছেড়ে শিশির জানায় আমরা যে মারা যাবার নই তা আমি জানতুম। কেবল কি করে যে বাঁচব এইটে আমার জানা ছিল না।

তুমি বলো না দাদা? লিলি বিস্মিত না হয়ে পারে না। তুমি জানতে?

বাঃ আমরা কখনো মরতে পারি? এত সহজে মারা যাবো বলিস কি? কেন, বন্দুকের ব্যবহারে তুই কি বুঝলি— কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে সব চলে গেল না? কুকুরের পেটের ভেতর দিয়ে আমাদের গন্তব্য পথ, এ কখনো ভাবতে পারা যায়।

শিশিরের ততোধিক বিস্ময় হয়ঃ কোনো অ্যাডভেঞ্চারের

বইয়ে এরকম পড়েছিস নাকি ? বইয়ের বীরবররা কখনো মারা পড়ে ?

ওঃ তাই বলো। এতক্ষণে লিলির কাছে বক্তব্যটা বিশদ হয় : কিন্তু এখনো আমাদের বেঁচে উঠতে দেরী আছে দাদা। ডাল-কুত্তারা এসে পড়ল বলে। তুমি ভাবছ দরজায় খিল এঁটে বাঁচবে ? যদি খিল ভেঙ্গে ঢুকে পড়ে ? ওরা এতগুলো আর আমরা দুজন। ওদের সঙ্গে গায়ের জোরে কি আমরা পারব ?

এই যে। হঠাৎ শিশির চেঁচিয়ে ওঠে : ঘরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আয়না রয়েছে দেখছি যে। চেঁচানর সঙ্গে সঙ্গে এবার সে লাফাতে শুরু করে ছায় : আর আমাদের পায় কে ?

আয় দুজনে মিলে এটাকে ধরাধরি করে দোরের বাইরে রেখে দিয়ে তারপর ভেতর থেকে খিল এঁটে দি। শিশির বাৎলায় : তারপর মজা দেখিস। কী মজা।

দুজনে মিলে সেই লম্বা চওড়া আয়নাটাকে পাঁজা-কোলা করে বাইরে এনে ওরা স্থাপিত করে—লম্বা আয়নাটাকে চওড়া করে দেওয়াল ঠেস দিয়ে রাখে দরজার ঠিক সুমুখ-টাতেই। তারপর ভেতরে ঢুকে খিল এঁটে দিয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বব্দে ডালকুত্তাদের আগমনের প্রতীক্ষা করতে থাকে।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। কয়েক মুহূর্ত পরেই তারা এসে পড়ে। হৈ হৈ করে সব এসে যায়।

ভৌ—ভৌ—ভো—ভো—ভৌ—। (সাদা বাংলায় ওর মানে, সব ভোঁ ভোঁ দেখছি যে। এর মধ্যেই ওরা সটকালো কোথায় ?) প্রশ্ন পত্র মুখে করেই, ওরা রোয়াকের উপর টকাটক লাফিয়ে উঠল এবং ওঠবা মাত্রই ওদের চক্ষুস্থির। ওদের প্রশ্নের যে এতবড় প্রত্যুত্তর ওখানেই অপেক্ষা করে রয়েছে তা ওরা ভাবতেই পারেনি। য়্যা একিরে বাবা, ওদেরই সগোত্র আর একপাল ডালকুত্তা মহড়া নিয়ে দরজা আগলাচ্ছে দেখা যায়।

ওদের পিলে চমকে গেল জয়ধ্বনি সেই সঙ্গে থমকে গেল। কেবল ঐ পালের মধ্যে যে মোড়ল গোছের তার গলা দিয়ে বেসুরো এক আওয়াজ গলে এল : ও—ও—ও—য়্যা—য়্যা—্যা—?

অর্থাৎ কিনা, এ আবার কি হ্যাঁ? এরা কারা হ্যাঁ? দুই ভাই বোনে খড়খড়ির ছোট্ট ফাঁক দিয়ে দেখছিল সব—শিশির লিলির কানের গোড়ায় ফিসফিস করে : দেখলি তো। দেখছিস তো। আর সে ঝাঁউ ঝাঁউ নেই। একেবারে মিউ মিউ। মিউ মিউ না হলেও ভ্যা—ভ্যা ডাক বেরিয়ে গেছে।

হুঁ-উ-উ। লিলি এক সুরে সায় ছায়! ওদের মধ্যে দার্শনিক কেউ থাকলে এই সময় এদের আসল নকল সমঝে দিয়ে ঠিক পথ বাতলে দিতে পারত।

ঠিক পথতো আমাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়া? তা সে যাই হোক। দার্শনিকের কাজ হচ্ছে নিজের চোখ চালানো, পরের ঘাড় বাঁচানো তো নয়। শিশির জবাব দেয়।

কুকুরদের ঘাবড়ে যাবার কথাই বই কি। নিজের আশে পাশে ওরা প্রত্যেকে মাত্র দুজনকে দেখতে পাচ্ছিল, কিন্তু সামনে একেবারে অগণন—সে যে কতগুলো ওদের আঙুলের ডগায় গোনা যায় না। অঙ্কের ভয়ে বা অন্য কোনো অঙ্কে ওদের লেজ আপনা থেকেই নেমে এল।

এবং কি আশ্চর্য, প্রতিপক্ষরা দলে বলে ভারী হলেও, নিজেদের পতাকা নামিয়ে ফেলল। ওরাও তাহলে ভয় পেয়েছে—ওধারের ওরাও। এতক্ষণ এদের প্রাণে আবার সাহস ফিরল, আবার এ-ধারের জয় পতাকা খাড়া হতে লাগল একে একে।

অন্য পক্ষের পুনরায় লাঙ্গুল উঁচানো দেখে এবার এরা চটে গেল। য়্যাঁ একি রসিকতা নাকি। নূতন সাহসে, নবোদ্যমে, এরা ওদের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ল এবার। এবং সেকি ঘোরতর লড়াই। আঁচড়া আঁচড়ি—চেঁচামেচি—কামড়া কামড়ি—

আয়নার ওপর সেকি ভয়ঙ্কর বায়না। এবং বলা বাহুল্য, আয়নার পক্ষও যুদ্ধ করতে কিছুমাত্র কসুর করল না।

খানিকক্ষণ সংগ্রামের পর ডালকুত্তারা কাতর হয়ে জিভ বার করে ফেললে। অপর পক্ষেরও সেই দুর্দশা দেখা গেল। পরস্পরের একই হাল দেখে এবার পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি জাগল ওদের। সাময়িক সন্ধি ঘোষণা করে, উভয় পক্ষের সামরিক ক্ষতির ক্ষতিয়ান নেয়া শুরু হোলো তখন। দুদলের মধ্যে মোটামুটি আলাপ আরম্ভ হোলো। আয়নারূপ দোভাষীর মধ্যবর্তীতায় সেটাকে প্রথম শান্তি বৈঠক বলা চলে।

যেমন কুকুর তেমনি মুগুর। লিলি এতক্ষণে কথা বলে। একটি প্রবচন দান করে এতক্ষণে।

মুগুর? মুগুর কিরে, মুকুর বল। যেমন কুকুর তেমনি মুকুর। মুকুর মানে আয়না জানিস তো?

কথাটা মুকুর নাকি? আমি জানতাম মুগুর। লিলি নিজের এতদিনের অজ্ঞতায় একটু অবাক হয়।

আরে মুগুরই তো। মুগুর আর মুকুর তো এক। আয়নায় নিজেকে দেখতে মিষ্টি লাগে না। গুড়ের মত—ঠিক মুগুরের মত মিষ্টি লাগে না কি? গুড় আর মুগুর কি আলাদা? শিশির ব্যাখ্যা করে দ্যায়।

এই বিপদের মাঝখানেও লিলির মুখে হাসি খেলে যায়। সে বলে: ঠিক দাদা। এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে দিয়ে ভাবে হায়, সামনে একটা আয়না নেই যে, এক ফাঁকে নিজেকে একটু দেখে নেয় এখন।

কিন্তু ভারী দুর্লক্ষণ। দেখেছিস। মুখ শোঁকাশুঁকি করে ওরা একটা বোঝাপড়ায় আসতে চাইছে। কনফারেন্স বসে গেছে দেখছিস না? এবারের জানলা টপকে এই বেলা এখান থেকে পালাই চ। শিশির বলে—ওর মুখে কোনো হাসি নেই।

পেছনের জানলাটা আবার বহুদিনের অব্যবহারে এমন জং ধরা যে সহজে খুলতে চায় না। ছিটকিনিটাকে হটাতেই শিশির কাবু হয়ে পড়ল। কিন্তু হাতে ধরে সাধাসাধি করলে অটলকেও টলতে হয়। সামান্য ছিটকিনি আর কতক্ষণ। খানিক পরে সেটা খটাস করে সরে গেল হঠাৎ।

শিশির টপকালো আগে। তারপর লিলির পালা। লিলি যদি বা কোনরকমে জানলার ওপরে নিজেকে খাড়া করতে পারল, নামতে আর পারে না।

আমার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়। তার পতন বেগে, বীরোচিত তার ছোট্ট দাদাটি দাড়াতে পারবে কিনা তার সন্দেহ হয়। ভয় কি। আমি তোকে ধরব। শিশিরের নিরুদ্বেগ আহ্বান। লিলি একটা পা বাড়িয়ে দ্যায়। কিন্তু আরেকটা পাকে কিছুতেই আর নামাতে পারে না। মূল্যবান মুহূর্ত সব অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। লিলির পায়ের পাশ দিয়ে কাল স্রোত কলকল বেগে বয়ে যাচ্ছে, শিশিরের আর তর সয় না, পা ধরে হ্যাঁচকা টান লাগায়।

লিলি নেমে আসে টানের সেই বিপাকে নির্বিঘ্নে পদচ্যুত হয়ে নিরাপদেই ধরাতলে অবতীর্ণ হয়, কিন্তু তার ফ্রকের খানিকটা ছিন্ন হয়ে পশ্চাদবর্তী ছিটকিনিতে আটকে থেকে যায়।

থাকগে। শিশির ফ্রকের উপসংহারের দিকে ভ্রূক্ষেপ করে বলে ঃ আমাদের জয় পতাকার মত উড়তে থাক।

পরাজয়ের নিশান বলো বরং। লিলি বলতে চায়। কেবল অসত্য বলেই জয় ঘোষণায় তার দ্বিধা নয়, ফ্রকের অসভ্যতায় সে বেশ চটে গেছে।

পরাজয় কিসের? কেন, আমরা কি অ্যাকটিং টু দি প্ল্যান পালাচ্ছি নে? ঠিক যেমন করে পালানো উচিত, পালাতে পারছি নে কি? শিশির গর্বিত না হয়ে পারে না।

তা পালাচ্ছি বটে। কুকুরের সামনে শেয়ালের মত পালাচ্ছি বটে। লিলি বলে।

উহুঁ। মোটেই তা নয়। পালানোটা সিংহের মত কাজ। পলায়নের শেষের দিকেই লায়ন। লায়নে আর পলায়নে একেবারে জড়াজড়ি!

এই বলে, উদাহরণস্বরূপই যেন সে আবার দৌড়াতে শুরু করে দ্যায়। লিলি আর প্রতিবাদ করতে পারে না, তাকে দাদার পিছু নিতে হয়।

বন্দুকগুলো তবু মানুষের মত ছিল। এই ডালকুত্তারা মোটেই তা নয়। দৌড়তে দৌড়তে শিশির বলে।

লিলি শুধু বলে—উঃ। এতদ্বারা আপত্তি বা সম্মতি কি জানায় বলা কঠিন।

গুলি গুলিও ভদ্রলোক। ওদের কর্তব্য ওরা করেছে। ওদের আর কাজ কি? কানের আশপাশ দিয়ে সোঁ সোঁ করে বেরিয়ে যাওয়া। তা ওরা চোঁ চোঁ বেরিয়ে গেছে, স্পর্শও করেনি, আমাদের।

লিলি কোন সাড়া দেয় না।

আমরাও আমাদের কর্তব্য করেছি। ওরাও যেমন আমাদের গায়ে হাত দেয় নি, আমরাও তেমনি বন্দুকের সামনে অম্লান বদনে বুক পেতে দিয়েছি। বুক অথবা পিঠ। আমরা তার কি কোনো অন্যথা করছি?

লিলি জবাব দিতে পারে না, শিশির যেমন পা আর মুখ, এক সাথে, খরতর বেগে চালাতে পারে ওর পক্ষে তা অসাধ্য। পায়ের সঙ্গে সঙ্গে শুধু ওর কান চলে। পা আর কান, পাল্লা দিয়ে, এক সঙ্গে চালানো যায়।

গুলির সামনে বুক পাততে আর কি? কী আর এমন কান পাতলেই হয়। সোঁ সোঁ করে চলে যাবে তাই কেবল শোনো।

ভয়ের কিছু নেই। শিশির নিজের অভিজ্ঞতার বিজ্ঞপ্তি দ্যায়ঃ কিন্তু এই ডালকুত্তারা, বাব্‌বা। একবার এরা হাতে পেলে আর রক্ষে আছে? সঙ্গে সঙ্গে দাঁত বসাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে নির্ঘাত—।

নির্ঘাত সাবাড়, বক্তব্যের এই কথাটা, সংবাদের শোচনীয় অংশ টুকু বোনের মুখ চেয়ে শিশির উহ্য রাখতে চায়। লিলি এবার ঘাড় নেড়ে—যে ঘাড়টা দৌড়নোর তালে তালে আপনা থেকেই নড়ছিল তার সাহায্যে দাদার কথায় সায় দেবার চেষ্টা করে। হতাহতের তালিকায় তার স্থান যে অক্ষুণ্ণ রয়েছে একথা তার অজানা নয় ঘাড় নেড়ে জানিয়ে দেয়।

ডালকুত্তারা এধারে নিজেদের মধ্যে পরামর্শ শেষ করে প্রতিপক্ষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদানের মুখেই ধাক্কা খেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বীরা সম্মুখ আলাপে অগ্রসর হতে দ্বিধা করেন নি, অম্লান বদনেই মুখ বাড়িয়ে ছিল, ওদের সঙ্গে সঙ্গেই বলতে কি। কিন্তু তথাপি সে আলাপের কেবল মৌখিকতাই সার। এতখানি সম্মুখীনতা সত্ত্বেও তার মধ্যে কি যেন কোমলতা নেই, কেমন যেন জিনিষটা মিষ্টি নয়। ভাবের মধ্যে কিসের যেন অভাব।

আয়নায় মুখ শোঁকা শুঁকি করতে গিয়ে মুখ ঠোকা ঠুকি করে, পুনঃ পুনঃ ধাক্কা খেয়ে হতাশ হয়ে পুনরায় যখন নিজেদের পরামর্শ বৈঠকে ফিরে এসেছে, তখন ওদের মধ্যে একজনের, অপেক্ষাকৃত ভূয়োদর্শী জনেকের মনে সন্দেহ জেগে সমস্ত জিনিষটাই ভুয়ো নয় তো? স্রেফ আরেকখানা ভূয়োদর্শন নয় তো?

ঘাড় বেঁকিয়ে তথাকথিত শত্রুদের দিকে সে একটা বঙ্কিম কটাক্ষ নিক্ষেপ করছে। তারপর মাথা নেড়ে আপন মনেই বলছে, "হুঁ। সব মায়া সমস্তই অসার। সবই ভগবানের লীলা। কিসসুই কিসসু নয়। তাহলে—তাহলে—তাহলে আর বৃথা মায়া বাড়িয়ে লাভ কি?

ভাবতে ভাবতে আর মনে হোলো, ওধারে খট করে একটু আগে একটা আওয়াজ হয়েছিল না? তারমানে খটকা লাগল কেমন।

এটাকে যেমন চোখের ভ্রম বলে বোধ হচ্ছে সেও কি তেমনি কানের ভ্রম ছাড়া কিছু নয়?

তাই যদি হয়, তাহলেও সেই ভ্রমকে অনুসরণ করে ঈষৎ করা যায়। পায়ের দিকে বাঁড়িয়ে ভ্রমণ করে দেখতে ক্ষতি কি? কিঞ্চিত ঘুর ফির করে দেখাই যাক না।

সেই ভূয়োদর্শীই সবার আগে একলা আবিষ্কার যাত্রী হয়ে খোলা জানলার পাশে পতপত রবে উড্ডীয়মান সেই জয় পতাকা দেখতে পেল। এবং সেই জয় পতাকার সঙ্গে জড়ানো পলাতকদের সৌরভ। আবিষ্কারের মতন একখানা আবিষ্কার। অমনি সে বাঙ্ময় হয়ে ওঠে প্রত্যাদেশের মত একটা আদেশ ছেড়েছে। হৈ চৈ করে হাঁক ডাক ছেড়ে সবাইকে একজোট করে ফ্যালে। ডালকুত্তাদের এমনি, একবার একটু গন্ধ পেলেই হোলো। পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই অমনি সেই গন্ধকে তাড়া করে তারা দৌড় লাগাবে।

এক্ষেত্রেও শিশির—লিলির পশ্চাদ্ধাবনে তাদের বিলম্ব হয় না। শিশিররা লম্বা পা ফেলে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছল, কুকুরে আর মুগুরে জড়াজড়ি করে একত্র হয়ে বেশ জব্দ হয়ে রয়েছে ভেবে খানিকটা নির্ভাবনাও যে না হয়েছিল তা নয়, এমন সময়ে আবার সেই চতুস্পদী পায়ের হাঁউ মাঁউ খাঁউ মানুষের গন্ধ পাঁউ না শুনে পেছনে না তাকিয়ে কারা পেছু নিয়েছে অনুমান করতে তাদের দেরি হয় না।

কিন্তু এবার? এবার কি? সম্মুখে যতদূর দৃষ্টি যায়, খোলা বাড়ী দূরে থাক, একটা খোলার বাড়ীও চোখে পড়ে না। চার ধারেই ধূ-ধূ মাঠ। কদ্দূর দৌড়িয়ে কোথায় গিয়ে তারা রক্ষা পাবে?

আর কি তাহলে পরিত্রাণ নেই? এখানেই শেষ? 'দি এণ্ড?' কোনো অ্যাডভেঞ্চারের গল্পেই যা ঘটে না, কদাচ ঘটে নি, অন্ততঃ

তাদের পড়াশোনার মধ্যে মনে পড়ে না, মৌলমীনের এই পরিত্যক্ত প্রান্তরে সেই অঘটন—সেই অঘটনীয় দুর্ঘটনা—সেই মৌলিক এবং অত্যন্ত মীন ব্যাপার—একান্তই ঘটে যাবে?

বন্দুকের হাতে বেঁচে—গুলিদের থেকে পদে পদে খুলি বাঁচিয়ে—ডালকুত্তাদের হাতেই ঘায়েল হতে হবে শেষটায়?

শিশির আর লিলি প্রাণপণে দৌড়তে থাকে। ডালকুত্তারাও ছেড়ে কথা বলেনা—তারাও দৌড়ায়। অচিরেই তারা কাছাকাছি এসে পড়ে।

প্রায় তিন শো গজের মধ্যে পৌঁছে যায়। তারপরে লম্বা লম্বা সম্ফক্ষেপে ক্রমশই ব্যবধান কমে আসতে থাকে।······আড়াই শো গড়....দুশো তেতাল্লিশ....একশো বিরাশী...একশো চৌত্রিশ... অন্তরায় কমে কমে অবশেষে একশো এগারোয় এসে দাঁড়ায়। এবং সেইখানেই দাড়িয়ে থাকে না, আসতে আসতে (আস্তে আস্তে নয়।) একেবারে নিরানব্বইয়ের ধাক্কায় এসে পৌছায়।

নিরানব্বই থেকে অষ্ট-আশী, ডালকুত্তাদের পক্ষে এমন কিছু কষ্টকর নয়। অষ্ট-আশী থেকে সাতাত্তর—সাতাত্তর থেকে সাঁইত্রিশ সাঁই সাঁই ব্যাপার।

ভৌ ভৌ ক্রমশই আরো ভয়াল হয়ে আগিয়ে আসে, কানের তালিতে এসে তালা লাগিয়ে দেয়।

এমন সময়ে—

এমন সময়ে সেই ছাগলের পাল—

অনেকক্ষণ আগে যারা ওধারে গেছেল, তারা ওধারের চর্বণ সেরে এধারে, বিচরণ করতে ফিরছে—ওধারের ভোজনপর্ব নিকেশ করে এধারের চর্ব্যচোষ্য চড়াও হওয়ার মতলবেই তারা আসছিল।

লিলি। লিলি। চটপট। ঐ ছাগলদের আসবার আগেই। খুব ছোট। যেমন করে হোক ছাগলদের ওধারে গিয়ে পড়তে হবে। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শিশির চীৎকার ছাড়ে। লিলি পারে না। তবু সে

শেষবার মরিয়া হবার চেষ্টা করে। এমনিতেই সে দাদার থেকে তের হাত পিছিয়ে পড়েছিল, কুকুরদের সাড়ে ছ গজ কাছিয়ে গেছল—কিন্তু তার পা আর উঠতে চায় না। শিশির নিজের গতি মন্দ করে লিলিকে আগিয়ে নিয়ে আসে, তারপরে তার হাত ধরে টান মেরে একসাথে দৌড় লাগায়।

একটু আগে যে পাথর খানার উপরে তটস্থ হয়ে তারা ছাগস্রোত নিবারণ করেছিল, একটু পরে সেই পাথরখানার ওপরেই তারা হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ে।

আর তার পরমুহূর্তেই সেই ছাগলের পাল উল্কা বেগে ব্যা ব্যা করতে করতে এসে পড়ে। সেই বিরাট শোভাযাত্রা অফুরন্ত উৎসাহে রাস্তা পারাপার করতে থাকে।

ডালকুত্তারা সেই ছাগলাদ্য সমারোহের সামনে এসে হচকচিয়ে থেমে যায়।

কি করবে ভেবে পায় না, ওদের ভেদ করে এগোবার কথা ওরা ভাবতেই পারে না।

শিশির—লিলি সেই পাথরের ওপরে দণ্ডায়মান হয়ে ছাখে ছাগলদের—ছাগলদের পরপারে কুকুরদের—

কুকুররাও যে তাদের দেখতে পায় না তা নয়।

লিলি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেঃ কতক্ষণ আর। ছাগলরাও চলে যাবে, ওরাও এসে আমাদের ছিঁড়ে খাবে।

হ্যাঁ, খেলেই হোলো। শিশির, তার নির্ভীকতা, ফিরে এসেছে আবার। খেলেই হোলো আর কি!

কেন, খাবে না কেন? আমি আর দৌড়তে পারব না দাদা তা বলে দিচ্ছি। পা তুলতেই পারছিনে।

দরকার নেই আর পা তোলার। ঠায় দাঁড়িয়ে ছাখ। কুকুররা আমাদের টের পেলে তো।

কেন, টের পাবে না কেন? জল জ্যান্ত ঐখানে দাঁড়িয়ে

আমাদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। দাদার কথায় লিলি অবাক হয়ে যায়।

দেখলেই বা। দেখে ওরা কিছু বুঝতে পারে না, গন্ধ থেকেই টের পায়। আমাদের গন্ধ আর পেলে তো? এই বোকা পাঁঠারা যা গন্ধ ছড়িয়ে গেল। শিশির নাক সিটকোয়। রামোঃ। এ গন্ধ এখন এক শতাব্দী থাকবে। শিলঙে ফিরেও সৌরভ পাবো।

যমালয়ে দরজার প্রায় সামনে এসে প্রাণান্তকর প্রান্ত পর্যন্ত তারা এগিয়ে পড়েছে। ততক্ষণে লিলির এই ধারণা ছিল। কিন্তু এখন দাদার কথার গন্ধর্ব লোক ঘুরে, সে আবার নূতন করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছায়। দারুণ দুর্গন্ধ নাক ভরে পান করে সে পুনঃ পুনঃ আরামে নিঃশ্বাস ছাড়ে—আঃ। বাস্তবিক এমন মিষ্টি গন্ধ, এহেন সৌরভ, কোনো মূল্যবান এসেন্সের মধ্যেও যে এতদিন পায়নি।

শিশিরের আন্দাজই ঠিক। পাঁঠারা চলে যাবার পর ডাল-কুত্তারা যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। কোন দিকে যে যাবে, কার গন্ধের ছুতো ধরবে—সে এক ভারী সমস্যায় পড়ে গেল তারা। শিশিরদের কাছেও এলনা যে তা নয়—সন্দিগ্ধভাবে দেখল খানিক, শুঁকেও দেখল কয়েকবার, কিন্তু নাসিকার সাহায্য নিয়েও পাঁঠাদের সগোত্র ছাড়া আর কিছুতেই তাদের ভাবতে পারা গেল না।

উঁহু যা ভাবছ তা নয়। আমরা তারা নই, সেই পলাতকরা আমরা নই। লিলি বলে, নিজের মনে মনেই বলে—উচ্চারণ করে বলার তার সাহস হয় না।

হে পাঁঠারা। তোমরাই ধন্য। নিজেরা মহিমান্বিত আমাদের মহিমান্বিত করে—নিজেদের সৌরভে আমাদের সুরভিত করেই কেবল তোমরা যাওনি, আমাদের সাথে সাথে এই দুর্দান্ত ডালকুত্তা-দেরও পাঁঠা বানিয়ে গেছ। শিশিরের সারা মন পাঁঠাদের লীলার মহিমা গানে মুখর হয়ে ওঠে।

ভৌ ভৌ? এরা কারা? এই দুটো উদ্ বেড়াল যারা দাঁড়িয়ে আছে এরা কি তারা? তাদের মতই বটে কিন্তু তারা তো নয়। এরা কারা তবে? ভৌ-ঔ-ও-ও-ঔ?

ডালকুত্তারা নিজেদের মধ্যে মুখ শোঁকা-শুঁকি করে। এই। এই। পাঁঠার ডাক ছাড়ঃ শিশির বলে ওঠেঃ শীগগির। দেখছিস কি?

ব্যা—ব্যা—ব্যা—। লিলি ডাকাডাকি লাগায়।

শিশির বলেঃ অ র র র র র র……

গন্ধে মেলা সত্ত্বেও শিশিরদের আকারে প্রকারে যাও বা ওদের সন্দেহোদ্রেক হয়েছিল, ছাগল বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হচ্ছিল, এখন লিলির ব্যাকরণে আর শিশিরের সংস্কৃত ভাষায়, ভাষার সাথে ব্যাকরণে নিখুঁত মিল দেখে তা তীরবেগে তিরোহিত হয়ে গেল। মানুষের হাবভাবে ওরা যে পাঁঠাদের পাঠান্তর ছাড়া কিছু নয়, এ বিষয়ে একমত হ'তে ওদের আর বাধা রইল না এবং তার পরেই নিজেদের ভোট শিশিরদের বিপক্ষের দিকে একে একে তারা লাঙ্গুল প্রদর্শন করতে লাগল। কুরুক্ষেত্র থেকে, কিছু না করেই, পৃষ্ঠ ভঙ্গ দিয়ে ফিরে চলল।

এখন আর ওদের সে লম্ফ ঝম্ফ নেই। সে উৎসাহ যেন কোথায় উপে গেছে। টুঁ শব্দটি নেই কারো। ধীর পদক্ষেপে নীরবে অধোবদনে ওরা ফিরে চলেছে।

সবাই মুখটি বুজে চুপটি চলেছে। দেখেছ দাদা, ডালকুত্তাদের কারো মুখে কোনো রা নেই। লিলি বলে।

কর্তার কাছে কী কৈফিয়ত—কী জবাব দিহি দেবে—সেই কথাই ওরা ভাবছে—মনে মনে তারই প্ল্যান ভাঁজছে এখন। কে জানে আজ হয়তো ব্যাটাদের ডাল রুটি বন্ধ।

এবার শিশির হাসে। এতক্ষণে ওর হাসি পায়।

এই নাও। শিশির গিয়ে তার মামার হাতে প্ল্যানটা ছাড়ল।

মামা বিস্মিত হয়ে উঠলেন, আর পর মুহূর্তেই তাঁর আনন্দের অভিব্যক্তি দেখা গেল। কিন্তু মনোভাব আভাস ভাষায় প্রকাশ করার জন্য এক মুহূর্ত না ক্ষয় করে, একটুও না দাঁড়িয়ে প্ল্যানটি পাবা মাত্রই যেমন তড়িৎ বেগে তিনি গেলেন, খানিক পরে তার চেয়েও, এমন কি ততোধিক ত্বরিত বেগে ফিরে এলেন তিনি।

কিছু নেই, কিছু নেই। তাঁর মেঘলা মুখ মণ্ডল থেকে যেন দীর্ঘ নিঃশ্বাসের ঝড় বয়ে গেল।

কিছু নেই, সে কি মামা? লিলিরও তাক লাগে। নাঃ সব সেই হতভাগা মামাটা নিয়ে সটকেছে। এর আগেই সটকান দিয়েছে। সেই কালনিমে অপয়াটা।

তা কি করে হবে? শিশির বিশ্বাস করতে পারে নাঃ এর মধ্যেই নিয়ে পালাবে কেমন করে? আমি তো গ্র্যাণ্ড মামাকে কাল রাত্রে কিছু নিতে দিই নি। চুইংগাম চালিয়েই তো ভাগালাম।

বাস্তবিক কি করে তা সম্ভব হতে পারে? কালকের রাত্রে ইতো নষ্ট স্ততো ভ্রষ্ট সেইসব নিক্ষিপ্তদের ঠেলায় বিরক্ত হয়ে—চুইংগামদের চাটুকারিতায় চটে গিয়ে, চটচটে হয়ে সেই যে তিনি তীর বেগে প্রস্থান করেছেন তার পরে ফের কখন এলেন আবার? তার পরে সেই তো—এই শিশিরই তো কতনা বীরত্ব দেখিয়ে উক্ত প্ল্যান উদ্ধার করে এই মাত্র ফিরল।

দাও তো দেখি প্ল্যান আমায়। শিশির বললে: দেখি আমি চেষ্টা করে। খুঁজে পেতে দেখা যাক একবার।

ব্রজেশ্বর বড়ুয়া অম্লান বদনে—কিংবা অতিশয় ম্লান বদনেই, প্ল্যানটা শিশিরের হাতে পরিত্যাগ করেন। যে-প্ল্যানের পেছনে

কোনো গুপ্তধনের কিনারা নেই তা রেখে লাভ? যার সমস্তটাই ফাঁকা—বেবাক ফাঁক—তা আর রাখা কেন?

নক্সাটার—সর্বস্বত্ব লাভ করে উল্লসিত হয়ে শিশির সেই গুপ্ত কক্ষে গিয়ে হাজির হয়। পার্চমেণ্টের ছকটাকে অনুসরণ করে, এগিয়ে পেছিয়ে, ডানধারে বাঁ-ধারে এঁকে বেঁকে, দুবার লেফট আর চার বার রাইট টার্ণ করে—রাইট কিংবা রং টার্ণ তা কেবল সেই বক্কেশ্বরই জানেন—অবশেষে নকশার উপদেশ মত, তিন পাক ঘুরে চিহ্নিত এক স্থানে গিয়ে সে উপস্থিত হয়, এবং উপস্থিত হয়েই সে লাফাতে আরম্ভ করে (যদিও লাফাবার কোনো নির্দেশ সেই নকশার মধ্যে ছিল না)—কিন্তু না লাফিয়ে সে করে কি,—একেবারে হুবহু সেই সেই চিহ্নই যে। নকশার নিশানার সঙ্গে অবিকল একেবারে। একটা শক্ত আঁক এমন ভাবে মিলে গেলে না লাফিয়ে কি থাকা যায়?

দুয়ে দুয়ে যেমন চার হয় (দুধও হয় নাকি, অনেকে বলে থাকেন) তেমনি অবলীলাক্রমে কত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল।

তারপর নকশার আদেশ মত তিনটি টোকা—চারটি নয়, দুটিও না—গুনে গুনে তিনটি টোকা—সেই চিহ্নটির পৃষ্ঠদেশে। আর তিনবার টোকবার পরেই—ঠিক যেমনটি শিশিরের আশঙ্কা ছিল—চকিতের মধ্যে, কোথা থেকে কী সরে গিয়ে উন্মুক্ত আঁধারে চক্‌চকে কত কী সব বেরিয়ে পড়ল।

হাঁসের ডিমের মতো—কিন্তু আকারে হয়তো বৃহত্তর—তেমনি সাদা আর তেমনি সুচারু—থরে বিথরে সাজানো কতগুলি—

কী ওগুলি? হীরে না জহরৎ? মাণিক না মানিক্য? মুক্তা না গজমতি? চুনী না প্রবাল মরকত—কী ওরা? রত্নতত্ত্বেও শিশির খুব ওয়াকিবহাল ছিল না—ও বিষয়ে ওকে প্রায় বিশেষজ্ঞই বলা চলে—তবু, বিশেষ অজ্ঞতা থাকলেও, যাই হোক, ওগুলো যে দামী চীজ সে সম্বন্ধে তার তিল মাত্র সন্দেহ রইলো না।

একেকটি করে গুনে গুনে দেখল শিশির—তেরটি সাত রাজার ধন এক মানিক—একমাত্র মানিকের সাত সাতটা রাজ্য কেনা যায়। কিন্তু এর একটার—এ হেন এক রাস—মাণিক্য দিয়ে কটা সম্রাটের কখানা সাম্রাজ্য কেনা যায় কে জানে?

বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে এই সব কথা শিশির ভাবছে—এমন সময়ে পেছন থেকে হেঁড়ে গলায় এক আওয়াজ এল: হাত তোলো।

য়ঁ্যা? চমকে গিয়ে শিশির পেছন ফিরল।

পিস্তল হাতে তার গ্র্যাণ্ড মামা। তুলে ফ্যালো। দেখছ কি আর? বক্কেশ্বর আইচ বজ্র নির্ঘোষে ঘোষণা করেন।

কেন হাত তুলব কেন? কী হয়েছে? শিশির বলে।

হাত তুলবে কেন, বলছ বেশ! বক্কেশ্বর কাষ্ঠ হাসি হাসেন: আমার হাতে এটা কী, দেখছ না?

দেখেছি, পিস্তল। তাচ্ছিল্য ভরে শিশির জানায়।

হঁ্যা, গুলি-ভরা ছ-নলা—দেখেছ ত? গ্র্যাণ্ড মামা আরো বিশদ করে দ্যান: এ রকম একখানা দেখলেই লক্ষ্মী ছেলের মত হাত তুলতে হয়। গুলি করে দেবো তা না হলে তা বলে রাখছি। হাত না তুলতেই গুলি করার নিয়ম।

অগত্যা, শিশিরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেই নিয়ম রক্ষা করতে হয়। হুঁ, যে-বিয়েতে যে-মন্ত্র। কাজের যা দস্তুর। ঊর্ধ্ববাহু দেখে প্রসন্ন হয়ে বক্কেশ্বর বিবৃতি দ্যান: তুমিও যদি এমনি এক খানা রিভলবার নিয়ে পেছন থেকে আসতে আর আমি তোমার অবস্থায় পড়তুম—আমিও হাত তুলে ফেলতুম। বলতে না বলতেই হুঁ।

আমার রিভলবার কই? শিশির ছোট্ট একটু নিঃশ্বাস ফেলে।

সেই তো—নেই তো। সে জন্যেই তো আমি সুবিধে করে নিচ্ছি। এসব কাজে এগুতে হলে রিভলবার নিয়ে এগুতে হয়। তাও জানো না?

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ রিভলবার হাতে রত্ন সম্ভারের দিকে

গুটি গুটি অগ্রসর হন। ধীরে ধীরে এগুতে থাকেন। এগুতে এগুতে শিশিরের নাকে আর পিস্তলে ঠোকাঠুকি লাগে। এ কি! দাঁড়িয়ে রইলে যে? পিছনে হটছ না কেন? পিছিয়ে যাও। পিছনে হটে পিস্তলের রেঞ্জের মধ্যে এসো। যাতে দরকার হলে তোমাকে আমি গুলি করতে পারি নাকের ওপর নল রেখে গুলি করা যায় না—তাতে পিস্তলের অপমান হয়।

শিশির তথাপি নড়ে না। পিস্তলের নলে আর তার গালে মোলাকাত হতে থাকে।

ছি ছি! ছবির মতো অমন দাঁড়িয়ে থেকো না, দোহাই তোমার। আমার কাজের বাধা হচ্ছে। অমন করলে, গুলি না দেগে এর ডাঁট দিয়েই এক ঘা সাঁটিয়ে দেব।

নাক ফেটে রক্ত পড়লে আমার দোষ নেই তখন। বক্কেশ্বর আইচের সর্তকবাণী শোনা যায়। পিছিয়ে যাও, ভালো কথায় বলছি। তিনি পুনঃ পুনঃ সাবধান করেন।

গুলিকে শিশির গ্রাহ্য করে না, কিন্তু নলাঘাতে তার ভয় আছে। অগত্যা একান্ত বাধ্য হয়েই কয়েক পা তাকে পিছুতেই হয়।

বক্কেশ্বর রত্ন ডিম্বগুলি নিরীক্ষণ করেন, সকৌতূহলে পর্যবেক্ষণ করেন সব। তারপরে, রুমালে বেঁধে ওগুলিকে করায়ত্ত করার তার চেষ্টা হয়। কিন্তু এক হাতে তাদের পাকড়ানো যায় না কিছুতেই।

ইস! ভারী মুস্কিল হোলো দেখছি। এই পিস্তলটাকে নিয়েই মুস্কিল হোলো। কোথায় যে রাখি। ততক্ষণ?

তুমি। তুমি ধরবে। তুমি ধরবে পিস্তল? বক্কেশ্বরের দু চোখ বিস্ময়ে কপালে গিয়ে ওঠে: তুমি যদি পিস্তল ধরো তা-হলে এই ডিমগুলো কি আর আমি ধারণ করতে পারব? পিস্তল যার, এগুলোও তার। বুঝেছ?

আর অধিক বাক্য ব্যয় না করে তিনি ডিম্বগুলিকে গ্রেপ্তার করতে অগ্রসর হন।

হাত তুলে থাকতে পারছি না। ব্যথা করছে। শিশির দুঃখের সঙ্গে জানায়। তাহলে এক কাজ করো। এগুলো আমার রুমালে বেঁধে ছেঁদে আমার পকেটে ভরে দাও।

গ্র্যাণ্ড মামার অনুজ্ঞায়, আর রিভলবারের অনুনয়ে, সেই গ্র্যাণ্ড রত্নগুলি শিশির রুমালের অন্তর্গত করে তাঁর পকেটস্থ করে ছায়।

নাও, এইবার প্ল্যানটা নিতে পারো। নিয়ে যাও, খেলা করগে। আমার আর এতে প্রয়োজন নেই। ইচ্ছা করলে তোমার মামাকেও এটা দিতে পারো—আমার সেই হতভাগা ভাগনেটাকে। তবু এ খানা দেখলে খানিকটা শোক সামলাতে পারবে। অনেকে যেমন প্রিয়জন খোয়া গেলে তার ফটো দেখে সুখী হয়।

এই বলে গ্র্যাণ্ড মামা শ্রীযুক্ত বক্কেশ্বর আইচ, মৃদুমন্দ হাসির সঙ্গে মৃদুমন্দ গতি মিলিয়ে, একেবারে গদ্য কবিতার মত মিলিয়ে দিয়ে, গদগদভাবে হেলতে দুলতে চলে যান।

॥ বিসর্গ থেকে অনুস্বর ॥

শিশির একছুটে সেই গুপ্তস্থান থেকে বেরিয়ে পড়ে। মামা ব্রজেশ্বর বড়ুয়া পেছন থেকে ডাক ছাড়েন, কিরে পেলি কিছু ?—কিন্তু শিশির আর ক্ষণমাত্র দাঁড়ায় না।

কাছেই একটা সাইকেলের দোকান সে দেখেছিল, সেখানে গিয়ে, পয়সা ফেলে, সাইকেল ভাড়া করে তৎক্ষণাৎ ছুট লাগায়। তার অযথা কালক্ষেপ করার সময় নেই।

বক্কেশ্বর আইচের সেই আড্ডাখানার উদ্দেশ্যে সে উধাও হয়। যেমন করেই হোক, গ্র্যাণ্ড মামার আগে গিয়ে সেখানে পৌঁছতে হবে। যেমন করেই হোক উদ্ধার করতে হবে নষ্টরত্নদের—না করে তার উদ্ধার নেই। বড় বড় মহাত্মারা যেমন পাপীতাপীদের সমুদ্ধার করে, সমুচিত ভাবে উদ্ধত করে পরিশেষে নিজেরা উর্ধ্বলোকে যান, তেমনি ছোটখাট একটা অবতার-স্বরূপ নিজেকে গণ্য করে শিশির। এবং এই নূতন অবতারণায় সে যখন সাইকেলে তার গ্র্যাণ্ড মামা পদব্রজে তখন উদ্ধারের পথে পরিষ্কাররূপে সে যে অনেকখানি এগিয়েই রয়েছে, তার আর ভুল নেই।

মামার আড্ডাখানায় পৌঁছে, সাইকেলটাকে এক কোণে লুক্কায়িত রেখে সে সেই উঁচু করা বাক্সগুলোর আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এবং খানিক পরেই হন্তদন্ত হয়ে গ্র্যাণ্ড মামাও সেখানে এসে হাজির। বক্কেশ্বরের সাড়া পেতেই তাঁর দলবলেরা হৈ হৈ করে এঘর ওঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে। কী হলো কর্তা? কদ্দূর এগুলো? উদ্ধার হলো কাজ? এই ধরনের প্রশ্নপত্র মুখে করে ঘেরাও হয়ে সবাই এগিয়ে আসে।

এই রে। ব্যাটারা সব বখরা নিতে আসবে। কম্মের ঢেকি, কেবল বখরা নেবার ওস্তাদ। বিনে পয়সায় বাগিয়ে নেবার ফিকিরে আছেন। দাঁড়া দিচ্ছি বখরা। ভালো করেই দিচ্ছি।

এই বলে—নিজের কানে কানে এই কথা না বলে বক্কেশ্বর আইচ ঝটতি তাঁর পকেট থেকে রত্নগর্ভ রুমালটা বের করে খাড়া করা বাক্সগুলার আড়ালে ফেলে ছ্যান।

মেঘ না চাইতেই জল। শিশির ওরই নেপথ্যে দাঁড়িয়ে ছিল, ওৎ পেতেই ছিল বটে সে, কিন্তু এতখানির জন্যে প্রস্তুত ছিল না। গাছে না উঠতেই এক কাঁদি, এইভাবে আপনা থেকেই, আকাশ ফুঁড়ে তার হাতে এসে পড়বে কে ভাবতে পেরেছিল? যেমনি না

রুমালের ঝুপ করে পড়া আর অমনি ওর নিঃশব্দে টুপ করে লুফে নেয়া। ব্রাডমান বল হাঁকড়ালে কার্ত্তিক বোস যেমন ক্যাচ ধরে থাকে ঠিক তেমনি।

দলবলরা এসে পড়তেই বক্কেশ্বর আইচ মুখ কাঁচুমাচু করে জানিয়ে দ্যান: নাঃ হোলো না, কিছুতেই হোলো না। ভাগনের খপরে গিয়ে যখন পড়েছে আর তার রক্ষে আছে—ভাগনেরা কি কম বিচ্ছু? এতো আবার ভাগনের ভাগনে, একেবারে জল বিছুটি।

কী! প্ল্যানটা উদ্ধার করতে পারা গেল না? দল বলরা বক্কেশ্বরের চেয়েও ম্রিয়মান হয়ে পড়ে।

আর প্ল্যান!—বক্কেশ্বর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফ্যালেন: প্ল্যানও উদ্ধার করেছিলাম, গুপ্তধনের কিনারা করতেও বাকী ছিল না, কিন্তু হলে কি হবে? ভাগনের ভাগনে যেখানে পিছু নিয়েছে—পেছনে লেগেছে যে ক্ষেত্রে সেখানে উদ্ধার করলেই বা কি আবার পিছু নিয়েছে যে তার হাতে চলে গেছে সে সব।

য়্যাঁ? উদ্ধার করার পর—আবার চলে গেল? সকলে একসঙ্গে আর্তনাদ করে ওঠে। গেলই তো মিথ্যে বলছিনা, আমার যথাসর্বস্ব সমস্তই আবার সেই মহা ভাগনের হাতে গিয়ে পড়েছে। তার কবলে সব এখন।

মিথ্যে বলতে কতবড় একটা মহাসত্য, নিজের অজ্ঞাত সারেই, গ্র্যাণ্ড মামা উচ্চারণ করেছেন, ভেবে শিবিরে হাসি পায়। রুমাল আর রুমালের ভেতরের মাল সে মুঠোর মধ্যে চাপে—আদর করে —নিজের গালে বুলোয়—আর অতি বড়ো মিথ্যাবাদীরাও কেমন করে সময়ে সময়ে সত্য কথার ফাঁপরে পড়ে যায় ভেবে মনে মনে বিস্মিত হয়ে থাকে।

দলবলরা সমবেত হয়ে হায় হায় করে। হা হুতাশ শেষ করে অতঃপর কিংকর্তব্য জানবার লালসা জানায়।

কী আর করব? এবার চাটিবাটি গুটোতে হবে এখান থেকে।

থানায় আমার ফোটো লটকানো আছে—সেই বদ ছেলেটা তা জানে। এবার আলবাত সে গিয়ে বলে দেবে। পুলিশে খবর পাবার আগেই এখান থেকে সরে পড়া, এই এখন আমাদের কাজ।

গুপ্তরত্ন উদ্ধার না করেই সরে পড়ব? ওদের ভেতরে একজন বলে ওঠে।

আমরাই বা একেকটা কি এমন কম রত্ন? আগে নিজেদের তো গুপ্ত রাখি। নিজেরা উদ্ধার পেলে, প্রাণে বাঁচলে অনেক গুপ্তরত্ন উদ্ধারের সুযোগ জীবনে আসবে।

এ কথার পর আর কথা নেই—সকলেই একবাক্যে ঘাড় নেড়ে সায় ছায়। ঠিক হয় বক্কেশ্বর আইচ সিঙ্গাপুরের দিকে পাড়ি দেবেন, আর দলবল সব রেঙ্গুন হয়ে অ্যাকীয়াবের দিকে রওনা হবে। পুলিশের সন্দেহ এড়ানোর জন্তেই এই—কর্তা একদিকে, কর্মরা অন্য-মুখো উদ্ধার হবার ব্যবস্থা, আপাততঃ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থেকে অচিরে, পরে আবার মান্দালয়ে গিয়ে নতুন ক্রিয়ার সম্মিলিত হলেই হবে। মৌলমীনের বন্দর থেকে পরশু দিন দু ধারের জাহাজই ছাড়ছে—তাতেই টিকিট কাটবার জন্য দলবলকে তিনি তক্ষুণি বেরিয়ে পড়বার হুকুম দিলেন।

দলবলরা কেটে পড়তেই, বক্কেশ্বর আইচ নিশ্চিন্ত মনে একটা সিগ্রেট ধরালেন: উঃ এতক্ষণে একটু দম নিতে পারা গেল। বাপ! শিশির যে মুহূর্তে প্যাকিং বাক্সের আবডালে আনন্দে বেদম, প্রায় তার কানের গোড়াতেই যেন তখন আওয়াজটা এসে লাগে—কে যেন ছুঁড়ে দ্যায় পেছন থেকে।

কই হে। দাও তো দেখি এবার

কে বলছে? কী বলছে—কাকে বলছে? শিশিরের চমক লাগে। এ তো তার গ্র্যাণ্ড মামার পেটেণ্ট গলা—কিন্তু তার কানের গোড়ায় কেন?

কী, 'ফল ধরো রে লক্ষ্মণ' করে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে?

হাতের সখ তো যথেষ্ট হোলো, এখন দাও ওগুলো।

য়ঁ্যা, তাঁকেই ডেকে বলা হচ্ছে যেন না? শিশিরের কেমন একটু সন্দেহ জাগে। কিন্তু সে যে ওখানে ঘনীভূত হয়ে রয়েছে সে তো গ্র্যাণ্ড মামার জানার কথা নয়। কানের ভ্রম নাকি তাহলে?

সন্দেহ দূর হতে দেরী হয় না ঠিক করে পিস্তলের বাঁটটা তার মাথায় এসে ঠোক্কর লাগায়।

ইস্! তুমি ত বড় বেকুব দেখছি হে। ভারী বোকা তো। কাষ্ঠ ঘোমটা ফাঁক করে গ্র্যাণ্ড মামা ওর মুখ দর্শন করেন।

শিশির শুধু বলে: ইস্!

এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত মাল মায় রুমাল সমেত গ্র্যাণ্ড মামার হাতে তুলে দ্যায়—নিজের অস্থাবর যা কিছু অপরের হস্তান্তর করে যথাসর্বস্ব খুইয়ে, সম্পতি হারা শিশির, নিজের মাথায় হাত বুলিয়ে বাঁচে।

॥ গ্র্যাণ্ড মামার গ্র্যাণ্ড ষ্ট্র্যাটেজ ॥

তোমার আগমন বার্তা কি করে টের পেলুম ভেবে তোমার তাক লাগছে। তাই না? ঠিক নিউটনের নিয়মে—মাধ্যাকর্ষণের জোরেই জানতে পারলুম। রুমালটা বাক্সগুলোর ওধারে চালান করার সময়েই সব জানতে পেরেছি। মালগুলোর নিঃশব্দ চাল চলনেই সমস্ত পরিষ্কার হয়েছে। ওদের নিঃশব্দে গিয়ে পড়বার কথা তো নয়। মাধ্যাকর্ষণের জোরে মাটিতে গিয়ে পড়বে আর সশব্দে গিয়ে পড়বে। তাল পড়ে ঢিপ করে জানো তো? ঢিপ করে তাল পড়ে তাও বলা যায়। কিন্তু পড়ে আর আওয়াজ ছাড়ে নিউটনের নিয়মেই। কিন্তু আমার তাল ঢিপ না করতেই

কে যে ওখানে কোন তালে রয়েছে বুঝতে আমার দেরী হয় নি। জিনিসটা যেন আশ্চর্য ভাবে আলগোছে থেকে গেল ত্রিশঙ্কুর মত ত্রিশূন্যে—ভারী জিনিসের এরকম ভূতুড়ে ব্যাপার ভাল নয় তো। তারপর এধারে ওধারে তাকাতেই গাছের আড়ালে সাইকেলটা নজরে পড়ল। ব্যস—তোমার কায়দা কানুন জানতে আর বাকী রইল না। কেমন এখন তো বুঝতে পারছো ?—

বুঝতে শিশির অনেকক্ষণই পেরেছে, অনেক আগেই,—মাথায় পিস্তলের ঠোক্কর খাবার সাথে সাথে তার দিব্য দৃষ্টি খুলে গেছল —তবে যেটুকু বুঝতে ওর বাকী ছিল এতক্ষণে বিশদ হোলো। তবুও মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে হাঁ করেও বক্কেশ্বরের বকুনি হজম করে।

এখন তুমি বন্দী আমার। বুঝেছ তো। সুড় সুড় করে লক্ষী ছেলের মতো আসবে—না, না? নইলে—নইলে দেখছ ত। পিস্তলের এই ব্যাট দেখেছ। তোমার মাথায় এটা ভাঙতে হলে বিস্তর ক্ষতি হবে আমার। ও পিস্তল তো আর এখানে সারানো যাবে না।

ক্ষতির কথা আর বেশী করে খতিয়ে দেখতে হয় না। বলতে না বলতেই শিশির বক্কেশ্বরের পেছনে পেছনে যায়। ছায়ার মত অনুসরণ করে দোতালায় গিয়ে ওঠে।

এই ঘরে তুমি বন্দী, বুঝেছ ভায়া ? বক্কেশ্বর মোলায়েম হাসি হাসেন ঃ বন্দীশালার পক্ষে ঘরখানি তেমন খারাপ নয়। দেখে শুনে কি রকম বুঝছ ?

শিশির ঘুরে ফিরে ঘরখানাকে লক্ষ্য করে।

তাকিয়ে দেখছ কি ? তেমন অসুবিধাজনক ঘর নয়। পালাবার পক্ষে প্রশস্তই চম্পট দেবার সুবিধা করা তোমার পক্ষে খুব কঠিন হবে না। চেষ্টা করে দেখতে পারো।

গ্র্যাণ্ড মামা ঠিক তার মনের কথাটি আন্দাজ করতে পেরেছেন।

তাঁর কথার ধাঁচে সেই কথার আঁচ পেয়ে শিশির লজ্জিত হয়ে পড়ে।

পালানো আর এমন কঠিন কি? এই জানলায় শক্ত করে একটা দড়ি বাঁধবে—বেঁধে লটকে পড়বে, ব্যাস্। তা বলে ভুল করে নিজের গলায় যেন বেঁধে বসো না—তাই বেঁধে লট্‌কো না যেন, সেটা কিন্তু ভারী খারাপ হবে আগেই বলে রাখছি।

সেই খারাপ একদিন তোমার বরাতে আছে। শিশির রাগ করে বলে—মনে মনেই বলে দ্যায়ঃ নির্ঘাত ফাঁসী রয়েছে তোমার অদৃষ্টে।

ওঃ, তাই তো। দড়ি কই? দড়ি তো নেই এই ঘরে। দড়ি একটা চাই যে।

এই বলে বক্কেশ্বর আইচ তাকে দাঁড় করিয়ে দড়ির খোঁজে অন্য ঘরে যান। খোঁজাখুঁজি করে ফিরে আসতে একটু তাঁর দেরীই হয়।

এর মধ্যে পালাবার চেষ্টা করো নি তাই ভালো। খোলা দরজা দিয়ে সোজা পিট টান দেওয়া একদম বন্দিদশার দস্তুর নয়, যা দস্তুর—যে ভাবে পালানো নিয়ম—যা দৃশ পলায়ন বন্দীদের পক্ষে গৌরবজনক তার পরাকাষ্ঠা হচ্ছে এই। এই বলে সপাৎ করে দড়িগাছটা শিশিরের ওপরে উনি ফেলে দ্যান।

কি করে আমি পালাবো সে তোমায় বলতে হবে না। এতক্ষণে শিশির একটা জবাব দেয়। আর কষ্ট করে বলে দিতে হবে না তোমায়।

না না, আমি কেন বলব। আমি বলবার কে? এসব তো পুঁথিপত্রে বিস্তারিত করে সব বলাই আছে। নেই বল?

আছে কি না আছে আমি বুঝবো।

দড়িটা শক্ত করে জানলার গোড়ায় বেঁধে যাই। কি জানি বাঁধনের দোষে যদি দড়ি সমেত ঝুলতে গিয়ে খুলে পড়ে হাত-পা

ভেঙে ফ্যালো। হাত পা ভাঙলেই তো হয়েছে। একটা পিস্তল সরানোই আমার পক্ষে কঠিন, তার ওপর তোমাকে সরাতে হলেই গেছি।

জানলার পাল্লায় তিনি দড়িটা মজবুত করে বেঁধে দ্যান। এইবার সব কাজই সহজ হয়ে রইলো। এগিয়ে রইলো অনেক। এখন তোমার কর্তব্য হচ্ছে, আমি চলে গেলে—আমার সামনে সটকানো ঠিক উচিত হবে ন—সুরুচি-সঙ্গত হবে না—ঠিক আমার তিরোধানের পরে, ধীরে সুস্থে, ঐ জানলা ধরে দড়ি বেয়ে সুড়ুৎ করে নীচে নেমে যাওয়া। আর নীচে পৌঁছতে পারলেই তো ফতে। পৌঁছলে কি পালালে। কিন্তু সাবধান, আগাগোড়া আমার নজর বাঁচিয়ে,—এই চোখে পড়লে আর রক্ষে থাকবে না—তক্ষুণি গুলি ছুঁড়ব। নিয়ম তো সব মানতে হবে। মেনে চলতে হবে আইন-কানুন। যে বিয়ের যে মন্ত্র—শাস্ত্রেই বলে দিয়েছে।

কি করে পালাতে হয় আমি জানি। এক কথায় শিশির জানিয়ে দ্যায়। জানবে বই কি! কার ভাগনের ভাগনে, সেটা তো দেখতে হবে। সত্যিই যদি বেমালুম পালাতে পারো তাহলে সেটা খুব সুখের কথাই। তাহলে তেমন বাহাদুর ছেলেকে এক-আধটা দামী রত্ন উপঢৌকন দিতে আমার দ্বিধা নেই। এই দ্যাখো এই দুটো রত্নডিম্ব এখানে রইলো সযত্নে রেখে দিয়ে গেলুম। একটা তোমার আর একটা তোমার বোনের। পালিয়ে যাবার সময় নিয়ে যেতে ভুলো না যেন।

আমার মামার জন্যেও একটা দাও। শিশির আবেদন করে। সেই আদেখিলা ভাগনেটার জন্যে? অপদার্থটাকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে না। তবে তুমি বলছ, তার জন্যেও একটা থাকল। তিন তিনটে গেল, যাক, দশটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট।

একেশ্বর হয়েই আমার খুসী। শিশির হাসি মুখে জানায়। বেশ, ভালো কথাই। এইবার আমি বাইরে থেকে দরজায় তালা

চাবি মেরে চলে যাই—আহারাদি করি গে। বাজারে গিয়ে কেনা-কাটা সারতে হবে। অনেক কাজ। পরশুই এখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করছি তো! হ্যাঁ, একটা কথা ভুলে গেছি বলতে—যেতে যেতে, থমকে দাঁড়িয়ে পিছন ফিরে তিনি বলে যান: আসল কথাই বলতে ভুলেছি।

কিছু বলার দরকার নেই। সব আমি জানি। শিশির নিজের কার্য প্রণালী সম্বন্ধে গ্র্যাণ্ড মামার অধিক উপদেশের অপেক্ষা রাখে না।

সেই ডালকুত্তাগুলোর কথা মনে আছে কি? তোমাদের যারা কালকে তাড়া করে গেছল? বেচারাদের বেজায় শাস্তি হয়েছে। তাড়া করবার জন্য নয়, তাড়া করে তোমাদের ধরে আনতে পারে নি সেই কারণেই কাল থেকে ওদের খাওয়া দাওয়া বন্ধ হয়ে আছে।

উচিত শাস্তি দিয়েছেন। শিশির উল্লসিত হয়। হ্যাঁ আর তারা রয়েছে এই জানালার নীচেটাতেই—ঠিক যেখানে এই দড়িটা গিয়ে শেষ হয়েছে সেইখানে। কাল থেকে কিছুটি খায়নি বেচারীরা। যদিও অনাহারী কাজ, তবু তোমাকে যদি ব্রেক ফাস্ট, করতে পায় যদি তুমি করতে দাও—না কি, তোমার তাতে খুব আপত্তি আছে? তোমার টেস্ট তেমন সুবিধের হবে না তুমি বলতে চাচ্ছ?

॥ শিশির সাহায্যে শিশিরের উদ্ধার ॥

শিশির রুদ্ধ ঘরে খানিকক্ষণ ক্ষুব্দ হয়ে থাকে। ক্ষোভ হবারই কথা। স্বহস্তে লাভ করে, অভাবিত পুনরুদ্ধারের পর, আবার যদি তা সেই হাত থেকেই লোপ পায় হাতে হাতেই লোপাট হয় তা হলে কার না ক্ষোভ হবে? এবং কেবল খোয়া যাওয়াই নয়, তারপরে এই সব খোয়াব। শিশির অতিশয় বিচলিত হয়ে পড়ে।

বিচলিত হয়ে ঘরটার চারধারে একবার চোখ বুলিয়ে জানলার বাইরে গিয়ে মুখ বাড়ায়। এদিকে ওদিকে উঁকি মারে, কই একজন কুকুরেরও তো ল্যাজ দেখা যাচ্ছে না। গ্র্যাণ্ড মামার স্রেফ ধাপ্পা নয় তো? হ্যাঁ, খেতে না পেলে ওরা বসে থাকবার পাত্র নাকি। খাবার সন্ধানে নিশ্চয়ই পাড়া বেড়াতে গেছে।

এ হেন সুবর্ণ সুযোগ—পরিত্রাণের এই অধোদয় যোগ উপেক্ষা করবার নয়। শিশির সেই ঝোলানো দড়ি ধরে ঝুলন যাত্রা করে বেরিয়ে পড়তে চায়। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করাও বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করে না। গ্র্যাণ্ড মামার দেওয়া দুর্লভ ডিম তিনটে, সাটের তিন পকেটে না পুরে, দড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে থাকে।

প্রায় ধরাতলে গিয়ে পৌঁছয় আর কি, অবতীর্ণ হয় হয়, এমন সময়ে কোত্থেকে গন্ধ পেয়ে ডালকুত্তার দল হৈ হৈ করে ছুটে আসে।

ঐ রে। ঐ ঐ। তাদের ঘেউ ঘেউ—এর মধ্যে ঐ একটি কথাই শোনা যায়। একবাক্যে ওরা অভ্যর্থনা করে।

শিশির আর মাটিতে পা দেয় না, ত্রিশঙ্কুর মতো শূন্য মার্গে নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে তরতর করে দড়ি ধরে আবার সে রুদ্ধ ঘরে এসে ওঠে।

বাব্‌বা, কক্ষচ্যুত হওয়া কি সোজা? কেন যে চন্দ্র সূর্যরা কক্ষভ্রষ্ট চায় না এক্ষণে বোঝা গেল। আর একটু হলেই হয়েছিল আর কি।

শিশির ভাবল, সাঙ্কেতিক ভাষায় লিলির উদ্দেশ্যে একখানা চিঠি লেখে। লিলি সেই চিঠি পেয়ে পত্র পাঠ, যে করেই হোক তাকে এসে উদ্ধার করবে।

পকেট থেকে কাগজ পেন্‌সিল বার করে চিঠি লিখতে বসল শিশির। একটু না ভাবতেই সাঙ্কেতিক একটা ভাষাও আবিষ্কার করা তার পক্ষে কঠিন হোলো না—AECTTAE TKNR MAKDB—পত্র বাহক, সে যে মিঞাই হোক, তার নির্দ্দেশের

জন্য এইটুকু মাত্র লিখে লিলিকে সে বলল: AKNA SAJ-KEY BPD—HAVE READ—AME KEYRBALLY BOW—COST—ATKAC—AKN SO—SA—

দরজার ওধারে কী যেন খুট করল। শিশির কান খাড়া করল—সে নিজে উৎকর্ণ হোলো বটে কিন্তু তার লেখনী থামল না—OK—KLO—OKLO ODK—?

এতখানি লিখে শিশির পড়বার চেষ্টা করে। এ কি রকম সাঙ্কেতিক ভাষা—এযে একেবারে জলের মত গড়গড় করে পড়া যাচ্ছে; বুঝতেও একটু দেরী লাগে না। কিন্তু—কিন্তু লিলি বুঝতে পারলে হয়। তাকে আবার বোঝাবার জন্যে শিশিরকে গিয়ে না পড়ে দিতে হয়।

শিশির আস্তে পাস্তে পড়ল:

এই চিঠিটি এই ঠিকানার মেয়েকে দিবি—

এখানে এসে যে কী বিপদে—পড়ছে—আমি কী আর বলবো—কষ্টে টিকে আছি—এখানে এসো—এসে ও কে? কে এলো?—ও কে এলো ওদিকে?

এই পর্যন্ত লেখা হয়েছে: এর পরে, তার মনে তখন থেকে যে সব ভাবের উদয় হচ্ছে, সাঙ্কেতিক ভাষার সাহায্য তার আবেগ প্রকাশ করতে হলে রীতিমত বেগ পেতে হয়। পেনসিল থামিয়ে গালে হাত দিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে শিশির।

মাথা ঘামাতে ঘামাতে তার মনে হোলো মর্ম বিন্দুর মতই ভাবনাটা ফুটে উঠল ভাষায় এলেই বা কি? না হয় ভাষায় কুলিয়েই ওঠা গেল, কিন্তু সেই চিঠি—তার সেই সঙ্কেত ধ্বনি—লিলির উপকূলে পৌঁছে দিচ্ছে কে? আশে পাশে বাধিত করা তেমন বাধ্য গোছের লোক কই? থাকবার মতো তো কতিপয় কুকুর, কুকুরের ল্যাজে বেঁধে খবর পাঠানো চলে, এই ধরনের একটা কাহিনী পূর্বে তার কানে গেলেও এসব কুকুরের সম্বন্ধে সে

কথা ভাবতেই পারা যায় না। না, ল্যাজ এদের থাকলেও এরা সে-কুকুর নয়।

অগত্যা, চিঠি লেখা ফেলে, পত্রান্তরাল থেকে বেরিয়ে অন্য পথে মুক্তির উপায় সে খুঁজতে লাগল।

আঁতি পাঁতি করে চারি ধারে তাকিয়ে, ঘরের কোণে, ছোট্ট এক কুলুঙ্গিত হিমানীর শিশির মত কী একটা তার চোখে পড়ল। হাতিয়ে নিয়ে ছাখে—হিমানীর শিশিই বটে, কিন্তু হিমানী নেই থাকলেও এ সময়ে নিজের মুখে চুনকাম করবার তাঁর উৎসাহ হোতো কিনা সন্দেহ। বরং তার গর্তে যে বস্তুটি দেখা গেল তার বর্ণ—পরিচয়ে যে কথা বলে তস্য গন্ধবিবরণীতেও ঠিক সেই কথাটিরই—হ্যাঁ—হ্যাঁচচো সাক্ষ্য ছায়। তার কান আর শিশির মুখে এক বিজ্ঞাপন—নস্যি ছাড়া আর কিছু নয়।

গ্র্যাণ্ড মামার সবই গ্র্যাণ্ড। যেমন পেল্লায় শরীর তেমনি পেরকাণ্ড নাক আর তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তেমনি একখানা নস্যির ডিবে। তিন জনাই যার পর নাই—হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁচচো—নাকের জলে চোখের জলে একশা হয়ে হাত পা নেড়ে মাথা ঝেড়ে হ্যাঁ হ্যাঁচতে, মাথা পরিষ্কার হয়ে, তার বুদ্ধি খুলে যায়। এই ত স্বহস্তেই তো। নিজের সমুদ্ধারের যৎ পরোনাস্তি সরল পথ। এই হিমানী মার্কা বৃহৎ ডিবিটার ভেতরেই তো সূক্ষ্মরূপে বিরাজ করছে তার মুক্তির উপায়। এতক্ষণ কি সেকথা তার নাকের মধ্যে সেঁধয় নি?...

পকেট থেকে রুমাল বের করে পরিষ্কার মুখ মুছে তাতে বেশ ভালো করে এ পিঠে ও পিঠে নস্য মাখিয়ে জানালা গলিয়ে ডাল কুত্তাদের সম্মুখে ফেলে দিল শিশির। একে এই ডালকুত্তারা গন্ধর শ্রেণীর, তার ওপরে গতকাল থেকে বুভুক্ষু—রুমাল পতনের সাথে সাথেই ওদের, একজন এসে শুকে দেখেছে। আর—আর যেই না শোঁকা—অমনি—অমনি না—যা একখানা জিনিষ হোলো তাকে

অকথ্য না বলে উপায় নেই। কুকুরের হাঁচি মানুষের ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তার বর্ণনার ভাষা নেই।

দেখতে না দেখতে প্রত্যেকেই সেই রুমালটা এসে শুঁকছে—

আর তার ফলে যে অনির্বচনীয় দৃশ্য—অশ্রুতপূর্ব কোরাস—পরমাশ্চর্য কাণ্ড শুরু হয়ে গেল তা আর কহতব্য নয়।

নস্যি—বোঝাই সেই রাম ডিবে পকেট ফাই করে শিশির তর তর বেগে দড়ি বেয়ে নেমে যায় এবার। সেই অধঃপতিত রুমালটি হস্তগত করে—বিদায়চ্ছলে সেই ডাল কুত্তাদের মুখের ওপর সেটি নাড়তে নাড়তে—যদি বা তাদের কেউ ওই রকম ব্যতি-ব্যস্ত অবস্থানেই মরিয়া হয়ে তাড়া করে আসে তাহলে তক্ষুণি তার মুখের ওপর সঙ্গে সঙ্গে নেড়ে দেবে তার জন্যে রীতিমত প্রস্তুত হয়েই—সেই সমবেত ঐক্যতান ভেদ করে শিশির সীমান্ত প্রদেশ পার হয়।

কিন্তু না, কুকুররা তাড়া করে না, নিজেদের অন্তর্গত তাড়নাতেই তারা অস্থির হয়ে আছে—ভেতরের আবেগে এত কাবু যে তাদের বুলি পর্যন্ত বের হয় না।

তাদের হাঁচাহাঁচি নাচানাচির ভেতর দিয়ে সহাস্য বদনে শিশির বেরিয়ে যায়।

॥ এক জনকে রোস্ট্ করব এক জনকে টোস্ করব ॥

সেখান থেকে শিশির এক ছুটে একেবারে মাতুল সমীপে।

এই নাও মামা, তোমার হারানো ধন। গ্র্যাণ্ড মামার কবল থেকে আমি উদ্ধার করে এনেছি—সাত রাজার ঐশ্বর্য এক মানিক।

এই বলে একটা ডিম্বাকৃতি রত্ন মামার কোলের ওপর ফেলে দ্যায়।

মামা বিস্ময় বিহ্বল হয়ে রত্নটিকে—ছুটি রত্নকেই এক দৃষ্টে দ্যাখেন। শিশির আর শিশিরের ডিম।

য়্যা আনলি? আনতে পারলি তুই। তার বাক্যস্ফূর্তি হলে বেরয়ঃ ধন্যি ছেলে তুই, সত্যি!

এখন নগদ কিছু টাকা দাও তো আমায়। সাইকেলগুলাকে মিটিয়ে দিয়ে আসি। আর ভাড়া করা সাইকেলটা গ্র্যাণ্ড মামার আস্তানায় খুইয়ে এসেছি।

মামা সে কথায় কান দ্যায় না—তাঁর কানেই যায় না সে কথা। তিনি সেই অপূর্ব ঐশ্বর্যটিকে, ঘুরিয়ে ফিরেয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করেন—আর তাঁর পর্যবেক্ষণের ফাঁকে শিশিরকে চকিতের জন্য নিরীক্ষণ করে নেন।

সাইকেলওয়ালাটাকে ঠিকানা দিয়ে দাও না। সেই লোক পাঠিয়ে উদ্ধার করে আনবে। লিলি পরামর্শ দ্যায়। তোমার নিজের যেতে চক্ষু লজ্জা হয় আমিই না হয় একটা পোসট কার্ড লিখে ফেলে দিচ্ছি। গ্র্যাণ্ড মামার বাড়ীর ছক কেটে পথ বাতলে দিলেই হবে।

তাই দে তো ভাই। শিশিরের ঘাড় থেকে যেন সাইকেলের পাহাড় নেমে যায়। সে আরামের নিশ্বাস ছাড়েঃ তোর বুদ্ধি খুব। সত্যি লিলি।

দাদার কাছে, বিশেষতঃ বিশল্যকরণী উদ্ধার করে আনা এ রকম বীরোচিত দাদার কাছে থেকে এ হেন সার্টিফিকেট লাভ করে এক গাল হেসে লিলি তক্ষুণি চিঠি লিখে ডাক বাক্সে দৌড়ে দিয়ে আসতে যায়।

মামার স্থাবর রত্নটিকে ট্যাকস্থ করে হন্ হন্ করে দর দালানে পায়চারি করতে থাকেন—আর এক কোণে দাঁড় করানো শিশিরের দিকে—তাঁর অস্থাবর রত্নটির দিকে মাঝে মাঝে ফিরে তাকান। যে রকম লোলুপ নেত্রে দৃকপাত করেন তাতে মনে হয়, সম্ভব

হলে সমাদরের আতিশয্যে তাকেও ট্যাঁকস্থ করতে তাঁর দ্বিধা ছিল না। কিন্তু অত বড় ধাড়ী ছেলেকে ট্যাঁকে আনা দূরে থাক—কায়দা করে কোলে করাই কঠিন।

তিনি হন হন করে ঘুরপাক খান—আর ঝন ঝন করে নূতন টাকার মত কথার টুকরো তার মুখ থেকে খসে পড়েঃ

উঃ এই মানিকটা! কতো দাম এর কে জানে। হয়তো বারো লাখ—কিম্বা সাত লাখ সাতাত্তর হাজারই হবে হয়ত। এক ক্রোড় হলেই বা কে কি বলছে। এই দিয়ে বোধ হয় এক জমিদার কেনা যায়। কিন্তু—কিন্তু যদি এর দাম দশ বিশ ক্রোড় হয়ে পড়ে—তাহলে?

এই সদ্যোজাত সমস্যা নিয়ে শিশিরের মুখোমুখি এসে তিনি দাঁড়ানঃ তাহলে? তাহলে কি?

প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত হয়ে শিশির উত্তর দেবার চেষ্টা করে।

তাহলে? গোটা আসামটাকেই আমরা কিনে নেব। মায় ধুবড়ি গোয়ালগাড়া গৌহাটী শিলং শিলেট শিলচর লামডিং নওগাঁ শিলঘাট জোড়হাট শিবসাগর তেজপুর তিনসুকিয়া ডিগবয় সব সমেত।

সারা আসামটাকেই এই ট্যাঁকে? প্রস্তাবটা যেন বক্কেশ্বরকে ধাক্কা মেরে—এতদূর—এতখানি তিনি ভেবে দ্যাখেন নি। কিন্তু ভেবে দেখে—আসামের মানচিত্র ভেবে ভেবে আর দেখে দেখে—প্রস্তাবটা তাঁর মনে লাগে। শিশিরের কথাটা তাঁর মনঃপূত হয়—তিনি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেনঃ গোটা আসামটাই এই ট্যাঁকের আসামী? তা—তা মন্দ কি?

মন্দ কি? শিশিরেরও কথাটা খুব মন্দ লাগে না। পুলকের আধিক্যে ব্রজের শিশিরকে দুহাতে উঁচু করে তুলে ধরেনঃ ভালা মোর ভাগনে। তুলে ধরে গদ্ গদ্ দৃষ্টিতে তাকানঃ এমন চমৎকার ভাগনে প্রায় দেখা যায় না।

বাহুগ্রস্ত শিশির লজ্জায় আর আনন্দে বিগলিত হয়ে ছটপট করে—আমার হাত থেকে ছাড়া পেয়ে মাটিতে পা দিতে পারলেই বাঁচে।

মামা কিন্তু সহজে ছাড়ে না—ভাগনের আর, ভাগনের প্রতি স্নেহ—তুইই তখন তাঁর মাথায় উঠেছে। শিশিরের এ হেন মাতুল ভক্তির পরাকাষ্ঠার প্রতিদান দেবার তাঁর বাসনা হয়।

নাঃ, সামান্য মৌখিক আদরে এই উপকারে ঋণ শোধ হবার নয়। এবং সমুচিত প্রতিদান দিতে হবে। ভাগনেরা যে আমাকে ভালবাসতে পারে—এতদূর ভালোবাসতে পারে আমি তা জানতুম না। ব্রজেশ্বরের চোখের কোণে শিশির বিন্দুদের দেখা যায়।

শিশিরের জামার হাতায় চোখ মুছে তিনি বলেন: আয়। আমার সঙ্গে আয়। লিলি? লিলিটা গেল কোথায়? সেও আসুক।

লিলি ততক্ষণে তার বক্তব্য ডাক বাক্সে পরিত্যাগ করে ফিরেছে, মামার হাঁকে তক্ষুণি এসে হাজির হয়।

লিলিও আমার খুব চমৎকার মেয়ে। মামার স্নিগ্ধ কণ্ঠ বেয়ে স্নেহের ঝরণা নেমে আসে। তু জনকে সমাদর করে নিজের ঘরে তিনি নিয়ে যান।

বোস্ এই খাটের ওপরে বোস্ তোরা। তক্ষণ বোস্। তৎক্ষণাৎ তিনি বেরিয়ে যান—তারপর কি মনে করে ফের ফিরে এসে ঘরের দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে বাহির থেকে শেকল তুলে ত্যান।

বেশী দেরী হবে না। আমি এলুম বলে। এই বলে বোধ হয় সান্ত্বনা দানের ছলেই বাহির থেকে পুনরায় বলেন:

ভয় খাসনে, ভয়ের কি আছে? তোদের একজনকে রোষ্ট করব —আরেক জনকে—?

আরেক জনকে কী করা যায়, কি ভাবে আপ্যায়িত করা যায়—কোন্ সুখাদ্যে পরিণত করতে পারলে বেশী সুস্বাদু হয়—একটু

ভেবে ঠোঁট চেটে নিয়ে তিনি জানান : আরেক জনকে টোষ্ট করা যাক ? কেমন, টোষ্টটাই তো ভালো—তাই না ?

॥ মামা তোমার মনে এই ছিল ? ॥

মামার বাণী শুনে শিশিরের শিরশির করে ওঠে।

আমাদের জন্য রোষ্ট আর টোষ্ট আনতে গেল মামা, তাই না ? জিজ্ঞেস করে লিলি—আমার ভাগে খালি যদি টোষ্ট পড়ে দাদা, তাহলে কিন্তু ভালো হবে না। রোষ্ট আর টোষ্ট আমরা ভাগাভাগি করে খাবো, কেমন ?

লিলির নিমন্ত্রণে শিশিরের উৎসাহ দেখা যায় না—সে শুধু বলে : আমাদের আর খেতে হবে না। মামাই সারবে।

মামা একাই সমস্তটা খাবে ? সবখানি রোষ্ট আর—?

পুনশ্চ যোগ করে সংক্ষেপেই শিশির জানায় : উহুঁ, মামাই খাবে আমাদের। আমাদের খাবে—আমাদের ? য়্যাঁ ? বিষয়টা ভালো করে বোধগম্য হবার সাথেই লিলি ককিয়ে ওঠে।

তা হলে শুনলি কি তবে ? তারই বন্দোবস্ত করতে গেল, বলে গেল কি ? দরজায় শেকল এঁটে গেছে দেখছিস নে ?

তাই তো—তাই-ই তো। মামার বিবৃতির সঙ্গে কার্যকলাপ জড়িয়ে দেখলে তাই মনে হয়। আর সেই সঙ্গে মামার প্রাচীন ইতিহাস—মামার পূর্ব জীবনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত—সেই অখাদ্য নর-খাদকের খাদ্য করার লালায়িত কাহিনী স্মরণ করে মিলিয়ে নিলে এ ছাড়া আর কিছুই মনে করা যায় না।

গ্র্যাণ্ড মামাকে পারা গেছল—মামার মামাকে হয়তো পারা যায়—সে তো আর সাক্ষাৎ মামা না—কিন্তু এই নিজের মামার স্নেহের ক্ষুধা থেকে নিজেদের বাঁচানো কি করে সম্ভব শিশির ভাববার চেষ্টা করে। চেষ্টা করতে গিয়ে মুষড়ে পড়ে। লিলি

তো খাটে লম্বা হয়ে পড়েছে। ভয়ে হাতে পায়ে খিল লেগে গেছে তার—মুখে কথা নেই।

ভয় কি, আমি ঠিক উদ্ধার করব। মনে মনে দমে গেলেও লিলিকে সে দম দ্যায়—তার প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টা করে ঃ

আমার একার হলে কথা ছিল না। আমি না হয় মামার পেটে চলে যেতে পারতুম—হাসতে হাসতেই চলে যেতুম। লোকে পরের জন্যে প্রাণ দ্যায়—মামাতো আর কিছু পর নয়। বৃষকেতু কার জন্যে প্রাণ দিয়েছিল? নিজের অস্থি-মজ্জা মাংস দিয়ে অথিতি সৎকার করতে সে কুণ্ঠিত হয় নি—দাতা কর্ণের গল্প পড়েছিস তো?

বৃষকেতু কি আস্ত একটা বৃষ্ছিল—গোরু ছিল একটা? আদৌ নয়। ঠিক কাজই করেছিল সে।

দাতা কর্ণ পড়েছি। লিলি ঘাড় নেড়ে জানায়।

হ্যাঁ কর্ণের মতো দাতা নেই। আগে পরের কথায় কান দিলেই, তার পরে আর না দিয়ে পার নেই। শেষে নির্ঘাত প্রাণ দিতে হয়। এই জন্যেই পরের কথায় কর্ণ দান করা নিষেধ। মামার কথা শুনে এ ঘরে না এলে তো আমাদের এই ফাঁদে পড়তে হোতো না। কিন্তু যা হবার হয়ে গেছে—সে কথা যাক। আমি তো একা নই—একা হলে মরতে আমার বাধা ছিল না, তুই আছিস যে। যে করেই হোক ছোট বোনকে আমার বাঁচাতে হবে। দাদার আশ্বাসে ভয়ানক ভরসা পেয়ে, লিলি এতক্ষণে উঠে বসে। ওই ছোট্ট দাদাটির ওপর তার অগাধ আস্থা।

কি করবে ভেবেছ? সাগ্রহে সে জানতে চায়।

দেখি কি করা যায়। মামাকে বলে কয়ে দেখি—তোকে ছেড়ে দ্যায় যদি। আমারই আধখানা রোষ্ট আর আধখানা টোষ্ট করে আমার ওপর দিয়ে চুকে যায় যদি।

না—না—না। লিলি বলে ওঠে ঃ তা হয় না।

কেন হয় না শুনি? একটা—মামা একলা কত খাবে?

উঁহু, তা হলে আমি বাদ যেতে রাজী নই। লিলি ঘোরতর আপত্তি জানায়—শিশির যদি না বাঁচে তাহলে সেও সহমরণে যাবে। মামার উদর পথে সেও তবে দাদার সহযাত্রী।

আমি তোকে এই ত্বটো দিয়ে দেব। শিশির লিলিকে ডিম ত্বটো দেখায়—এর একটা তোর; একটা আমার—গ্র্যাণ্ড মামা জমা দিয়েছে। আমারটাও তোকে দিয়ে দেব তুই দেশে গিয়ে এই বেচে খুব বড় লোক হতে পারবি; কত যে চকোলেট কিনতে পারবি, তার ইয়ত্তা নেই। আর ঘর ভর্তি চিনে বাদাম। শিশির লিলিকে লোভ দেখায়।

না না—সে হয় না। লিলি তথাপি ঘাড় নাড়ে। তা হলে তো ভারী মুস্কিল হোলো। ত্ব জনকেই দেখি উদ্ধার করতে হবে আমায়। ভারী শক্ত কিন্তু।

শক্ত তো বটেই—শিশির ঘাড় হেঁট করে ভাবে। এক জনকে বাদ দেয়া যেতো—কিন্তু ত্ব'জনকে বরবাদ করতে মামাকে রাজী করানো যাবে কিনা সন্দেহ।

লিলির সহসা কৌতূহল হয়। মামা হঠাৎ আমাদের খেতে চাইছে কেন? আমরা কি করেছি? বাঃ মামার ধনরত্ন উদ্ধার করে এনে দিলুম যে।

সে তো ভালই করলুম মামার।

ভালই তো। মামাও তো সেটা ভালভাবে নিয়েছে। আর তাতেই আমাদের হোলো কাল। মামা আমাকে ভালোবেসে ফেলল যে। আমার খাতিরে তোকেও আবার ভালোবাসল কিনা।

লিলি শিউরে ওঠে—ষ্টেশন থেকে তাদের নিয়ে আসার সময়ে মামার গল্প তার মনে পড়ে। ব্রজেশ্বরের অভিযানে—সেই নর-খাদক গলাধঃকরণের পর—সেই বনভোজনের পর থেকে—ভালো-বাসার একটি মাত্র অর্থ। যাকে ভালোবাসো তাকে ভালো

জায়গায় বাসা দাও। আর হৃদয়ের একান্ত সন্নিকটে উদরের মতো এত উপাদেয় স্থল আর কোথায়।

ঘিগলবার কলকলধ্বনি ওদের কানে আসে। খড়খড়ি ফাঁক করে সন্তর্পণে ওরা দ্যাখে, এর মধ্যেই মামা ইটের পাঁজা সাজিয়ে দরজার অদূরেই প্রকাণ্ড একটা উনুন খাড়া করেছে। আর সেই উনুনের মাথায় পেল্লায় এক কড়াই—। এই মাত্র তলাকার শুকনো কাঠে আগুন ধরানো হোলো এ ধারেও দাউ দাউ করে উঠেছে আর ওধারেও কড়াইয়ের ওপরে ঘি কলকল করতে লেগে গেছে।

উনুনের এক পাশে স্তূপীকৃত কাঠ—আর তিনটে ঘিয়ের ক্যানাস্তারা ফাঁক। এর মধ্যেই মামা ইটে আর কাঠে, আর ঘৃতাহুতিতে তাঁর দক্ষযজ্ঞ অনেকখানি এগিয়ে এনেছেন।

ঘিয়ের কলকল ধ্বনি শুনে আর জ্বলন্ত দৃশ্য দেখে শিশিরদের চোখ তো ছানাবড়া।

হায় মামা, তোমার মনে শেষে এই ছিল, দীর্ঘ নিশ্বাসের সাথে সাথে লিলির মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে : তুমি যে আমাদের হাড় মাস ভাজা করবে, তা ভাবতেও পারিনি।

॥ প্রাণ নিয়ে টানাটানি ॥

ঘি যতই কলকল করে, লিলির চোখ ততই ছলছল করে। শিশির বলে : ঘিটা ভালো নয়—শ্রীঘৃত নয়—বিশ্রী ঘি।

লিলি কোন জবাব দ্যায় না।

চর্বির ভেজাল আছে, গন্ধে টের পাচ্ছিস না? শিশির পুনরপি বলে। জ্বাল দেবার সাথে সাথেই জালিয়াতি জানা গেছল—দুর্গন্ধে মাত করে দিয়েছিল চারধার। কিন্তু চর্বির ভ্যাজাল থাকলেই বা কি, খাঁটি ঘিয়ের তুলনায় আর ভাজবার ক্ষমতা কি

কিছু কম? হাড়—মাস ভাজা ভাজায় সেই বা কম যায় কিসে? আর চর্বির ভর্জিত হলেই বা মামার চর্বি চর্বনের পক্ষে অসুবিধা কোথায়? বড় জোর ব্রজেশ্বরের অম্বল হতে পারে—গলা জ্বালা পেটের অসুখ অবধিও গড়াতে পারে হয়ত—কিন্তু তাতে আর গর হজম হওয়াদের কী সান্ত্বনা?

লিলি চুপটি করে থাকে। ঘিয়ের বিষয়ে কেন যে অত খুঁতখুঁতে হতে হবে, সে ভেবে পায় না।

মামা তো কই এখনো কাটছে না আমাদের? শিশিরকে একটু যেন ব্যস্তই দেখা যায়ঃ আস্তই চাঁপিয়ে দেবে নাকি?

আস্তে আস্তেই টের পাব। লিলি বলে। দাদার এত ব্যাগ্রতা তার ভালো লাগে না।

কাটুক কি কুটুক কি আগুনেই চাপাক, দরজাটা একবার খুললে হয়। শিশির বলেঃ একটা মতলব এঁটে রেখেছি।

কী মতলব? লিলির এবার আগ্রহ দেখা দেয়।

আমার কাছে সেই প্ল্যান খানা রয়েছে কিনা। মামাকে একটু ধাপ্পা মারতে হবে। মামাকে বলতে হবে যে এই রত্নটি তো—কেবল নমুনা মাত্র। এরকম আরো বিস্তর সেই গুপ্ত কক্ষে লুকানো রয়েছে। এই প্ল্যান ধরে খুঁজে পেতে বার করতে হবে। এই না শুনলে মামা নিশ্চয়ই লোভে পড়ে তক্ষুণি সেই ঘরে খুঁজতে যাবে—আমাদের রান্নাবান্না আপাতত স্থগিত রেখেই চলে যাবে। আর আমরা সেই ফাঁকে—

বুঝেছি। বাধা দিয়ে লিলি বলে ওঠেঃ কিন্তু মামা ভারী হুঁশিয়ার, এমন তৈরী রোসট ফেলে রেখে—বেগুনি ফুলুরীর ফলার ফেলে—

আরে, ভোজদের আগে দক্ষিণা পেলে কে না খুশি হয়। মামা তো মামা। দেখিস না কেন, কেমন দৌড় মারে—দেখিস তখন।

মামার আগমনের প্রত্যাশায়—দ্বারোদঘাটনের অপেক্ষায়—

গ্র্যাণ্ড মামার ফেরত দেয়া প্ল্যান খানা পকেট থেকে বার করে শিশির। প্ল্যানটার পেছনে—অপর দিকে—এ আবার কিসের খসড়া? আরেকখানা নকশার মতো দেখা যাচ্ছে যে। এ আবার আরেক কোন গুপ্ত কক্ষের হদিস?

শিশির বিস্মিত হয়ে নূতন নকশাটার ওপরে চোখ বুলোয়। যে ঘরে তারা বন্দী রয়েছে, অনেকটা সেই ঘরের ছক মতন যেন। ছকের নির্দেশ মত অনুধাবন করে—ঘরের মধ্যেই দৌড়াদৌড়ি করে একটা কোণে গিয়ে তারা হাজির হয়। সেখানে কোণ ঠেসা হয়ে একটা নির্দিষ্ট স্থানে শিশির ঘা লাগায়।

অবাক কাণ্ড! ঘা মারতেই জায়গাটা যেন নড়তে থাকে—তারপর আস্তে আস্তে সরতে সরতে অনেকখানি ফাঁক হয়ে যায়, সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো ফাঁক বেরিয়ে পড়ে। সিঁড়ি পথ দেখা যায়।

টেবিলের ওপর থেকে মামার টর্চটা নিয়ে আয়তো লিলি। গুহার মধ্যে আলো ফেলতেই যতদূর স্পষ্ট হয় তাতে সুড়ঙ্গ বলেই সন্দেহ হয় বটে। কিন্তু সুড়ঙ্গরূপী এই সন্দেহকে অনুসরণ করে এগুনো যায় না—এ পথ গেছে কোন্‌খানে? ইহাই প্রশ্ন।

সুড়ঙ্গটা যেমন নোংরা তেমনি আবার সন্দেহবাদী—কিন্তু যতই বিশ্রী হোক বিশ্রী ঘিয়ের পথ পরিত্যাগ করতে হলে এ ছাড়া সম্প্রতি অন্য পথ আর নেই, এই ভেবে টর্চ হাতে ওরা সুড়ঙ্গ পথে পা বাড়ায়।

সুড়ঙ্গটা সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে নেমে গেছে। কোন রকমে হেঁট করে অধোবদনে নামা চলে। শিশির যায় আগে আগে—লিলির হাত ধরে। যতই এগোয়, বিচ্ছিরি সোঁদা সোঁদা গন্ধ ওদের নাকে এসে কামড় লাগায়।

খানিক দূরে এগুতেই সিঁড়ি কাঁপতে থাকে—ইটের গাঁথনি হলেও, কেন বলা যায় না, তাদের পায়ের ভারেই যেন টাল খায়।

সামনে পেছনে—এধার ওধার থেকে এক আধ খানা ইট খসে পড়ে।

এই। পা টিপে টিপে হাঁটছিস কি? তাড়াতাড়ি আয়। চারধার কাঁপছে, দেখছিস না? শিশির তাড়া লাগায় লিলিকে।

ভূমিকম্প নাকি দাদা? লিলি ভয় খেয়ে যায়। সুড়ঙ্গটা ওদের পিছু পিছু পড়তে পড়তে—ধরাশায়ী হতে হতে আসছে বলে মনে হয়।

তা হলেই তো হয়েছে। সুড়ঙ্গের মধ্যেই ইঁদুর মরা হতে হবে। সুড়ঙ্গের পেছনের পথ অবরুদ্ধ—তাদের অনুসরণ করে বুঁজে এসেছে ক্রমশই বুঁজে আসছে। টর্চ ফেলেই দেখতে পায় ওরা। লিলিকে সাপটে নিয়ে শিশির তাড়াতাড়ি পা চালায়।

সুড়ঙ্গ পথের গোটা কয়েক বাঁক ঘুরে, নীচের তলে নেমে, নালার মতন একটা প্রণালীর ভেতর দিয়ে গুঁড়ি মেরে ওরা বেরিয়ে আসে। বাইরের আলোতে বেরিয়ে হাঁপ ছাড়ে।

এ কি! সত্যিই তো! প্রকাণ্ড অত বড় বাড়ীটা অমন করে কাঁপছে কেন? পায়ের মাটি স্থির অথচ—ভূমিকম্প তো নয়। কম্পান্বিত বাড়ীর থেকে সভয়ে ওরা সরে এসে দূরে এসে দাঁড়ায়।

দেখতে না দেখতে সমস্ত বাড়ীটা হুড়মুড় করে হৈ চৈ করে ভেঙ্গে পড়ে—ইটে কাঠে কড়ি বরগায় পুঞ্জীভূত হয়ে প্রত্যক্ষ বিভীষিকা হয়ে ওঠে।

॥ বিনা টিকিটের যাত্রী ॥

বাড়ীটা ভারী ভয়াবহ, কেন যে সেই বম্বিজটা মামাকে একথা বলেছিল বোঝা যাবে এখন—শিশির বলে।

তুমিও তো বলেছিলে বাড়ীটার চাল চলন ভালো নয়—লিলি

মনে করিয়ে দেয়। বলেছিলাম কিনা? প্রথম দর্শনেই মনে করিয়ে দিয়েছিলাম। শিশির নিজের কথার প্রমাণ লাভ করে পুলকিত হয়ঃ দেখলিত চাল চলনটা? আরেকটু হলে আমাদের ঘাড়েই হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল আর কি। নিজের চোখেই তো দেখলি।

হুঁ। এ রকম গায়ে পড়া বাড়ী ভালো না। লিলি মুখ ব্যাঁকায়।

কিন্তু মামা? মামা যে ঘিয়ের কড়াই নিয়ে ওর মধ্যেই থেকে গেলরে। শিশির লাফিয়ে ওঠেঃ চাপা পড়ে রইল যে। মামাকে তো উদ্ধার করতে হয়।

কিন্তু মামা যদি আবার খেতে চায়? লিলির ভীতি প্রকাশ পায়। সে তখন দেখা যাবে। আগে তো মামাকে বাঁচাই।

শিশির একখানা করে ইট সরাতে আরম্ভ করে। পনের কুড়ি মিনিটের মধ্যে প্রায় নব্বই আশী খানা ইট সরিয়ে ফ্যালে—লিলিও তার সহযোগিতায় এগোয়—কিন্তু দুজনে মিলে উঠে পড়ে লাগলেও সে আর কখানা ইট! পর্বত প্রমাণ ইটের পাঁজাখানা তাদের সামনে স্তূপাকার! ধরাশায়ী অট্টালিকার নিঃশব্দ অট্টহাসির আকর্ণ বিস্তারের সামনে তারা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

আরো খান দশেক ইট হটিয়ে শিশির হাঁফ ছাড়েঃ এক শতাব্দীতে কী পেরে উঠবে? এই সব ইট ঠাঁই নাড়া করতেই কলিযুগের বাকী ক'টা দিন কেটে যাবে।

মাগো! কম কি ইট! লিলিও যোগ ছায়ঃ এই ক'খানা নাড়তেই আমার হাতে ফোসকা পড়ে গেল! লিলি নিজের ফোসকানো হাতে ফুঁ দিতে দিতে বলে—খান ত্রিশেক সে নড়িয়ে ছিল—কিন্তু তাই নাড়তেই আর নড়াতে ব্যথা হয়ে গেছে।

তাহলে—তাহলে আর কী হবে। শিশির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেঃ এই একখানা করে ইট সরিয়ে মামার কাছ অবধি গিয়ে

পৌছতেই আমাদের চুল দাড়ি সব পেকে যাবে। আমরা বুড়ো হয়ে যাবো।

দাড়ি পাকার কথায় লিলির আপত্তি করার ছিল, শিশিরের দাড়িই হয়নি—এবং লিলির—লিলির না হলেও—লিলির কোনো দিনই হবে না। কিন্তু বুড়ো হয়ে যাবার কথায় প্রতিবাদ করার কিছু নেই—ওটা পাকা কথা। তবু বয়স বাড়ার কথাটা মেয়েদের কাছে পছন্দসই কথা নয়, লিলিকে কাজেই চেপে যেতে হয়।

আর ততদিনে কি ওই ইষ্টক সমাধির মধ্যে মামা বেঁচে থাকবে? শিশির নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করে: আমার তো বিশ্বাস হয় না।

এতক্ষণই বেঁচে আছে কিনা কে জানে। লিলি সদুত্তর দ্যায়: মামা পিষ্টক হয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়! ছাত চাপা পড়লে ছাতু না হয়ে যায় না!

তাহলে তো হয়েই গেছে। তবে তো বৃথা চেষ্টা! তাহলে আর একাজে হস্তক্ষেপ করা কেন? শিশির ইটের পিঠ থেকে হাত গুটিয়ে নেয়।

মামার কোনো দোষ ছিল না। সেই বুনো জংলীটাই অনর্থক মামার পেটে গিয়ে মামার স্বভাব বিগড়ে দিয়েছিল। সেই যত নষ্টের গোড়া।

এতক্ষণে লিলির মুখে তবু একটু মামার গুণকীর্তন শোনা গেল! পরলোকগত মাতুলের জন্যে শোক প্রকাশের সুযোগ এল তার।

হুঁ! মামা—লোকটা ভালোই ছিল রে। দোষে-গুণে মানুষ। শিশির মামার জন্যে আপসোস করে: মামা হলে কি হবে ভালো-বাসতে জানত!

ভয়ানক। বলতে না বলতে লিলির চোখমুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে আসে: এখানে আর দাঁড়িওনা দাদা! আমার ভারী কান্না পাচ্ছে।

চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। এই মৌলমীন থেকেই চলে

যাব। এখানে আর কি জন্যে? আজই যে জাহাজ ছাড়বে তাইতে চেপে বাড়ীর দিকে পাড়ি দিই চল।

জাহাজঘাটার দিকে ওরা পা চালায়! লোকের মুখে মুখে পথের বার্তা নিয়ে বন্দরের দিকে এগিয়ে চলে।

বাঘকে যেন যে মামা বলে এতদিনে জানলাম। যেতে যেতে জানায় শিশির। আমাদের মামাকে দেখেই জানা গেল। কিন্তু যাই বল্ লিলি, মামার মতই মামা ছিল আমাদের। অমন বাঘা মামা প্রায় হয় না।

মামার গৌরবে শিশির গর্ব বোধ করে।

তা ঠিক। লিলিও গর্বিত হয়ঃ কিন্তু আবার চাঁদকেও তো মামা বলে থাকে।

সে তোদের বেলা। সে আমাদের ভাগনেদের বেলা। সে আমাদের ভাগনেদের বেলা বাঘা মামা, কেবল আমাদের তাড়া করে ফেরে, সেই মামাই আবার তোদের ভাগনিদের বেলায় চাঁদা মামা—কথায় কথায় কেবল চাঁদা দ্যায়।

লিলি সলজ্জ হয়ে চুপ করে থাকে। ভাগনি—সুলভ অভিজ্ঞতায় এ কথা অস্বীকার করতে পারা যায় না।

কিন্তু আমাদের এই মামার বেলা সে কথা বলা চলে না। শিশির বুক ঠুকে মামার সমর্থন করেঃ আমাদের মামাকে অমন পক্ষপাতী বলতে পারবে না কেউ।

একদম একচোখোপনা ছিল না—দুজনকেই সমান দৃষ্টিতে দেখেছে। তাই নারে লিলি?

এ কথাও অস্বীকার করা কঠিন। মামার সমদৃষ্টির কথা মনে পড়তেই লিলি শিউরে ওঠে।

জাহাজঘাটায় গিয়ে জানা যায়, রেঙ্গুনের জাহাজ ঠিক তক্ষুণি ছাড়বে। টেনাসেরিম থেকে আসা জাহাজ, সেখান থেকে ছেড়ে, রেঙ্গুন একীয়াব, চট্টগ্রাম হয়ে সরাসরি কলকাতায় গিয়ে পৌঁছবে।

টিকিট করার সময় ছিল না—জাহাজের পাতাটন ওঠাচ্ছিল—ছুটোছুটি করে গিয়ে ওরা উঠে পড়ে। ওরাও ওঠে, পাটাতনও ওঠানো হয়। জাহাজও সঙ্গে সঙ্গে ভোঁ দিয়ে সরতে থাকে।

জাহাজের টিকিট চেকার যাত্রীদের টিকিটের খোঁজ নিয়ে ফিরছিল। ঘুরতে ঘুরতে শিশিরদেরও কাছে আসে— তাড়াতাড়িতে টিকিট করা হয়নি—জানাতে বাধ্য হয় শিশির। তাছাড়া—টিকিট কেনার টাকাও তো তাদের কাছে ছিল না।

য়্যাঁ? একি তোমরা সরকারী রেলগাড়ী পেয়েছ নাকি, যে বিনা টিকিটে লম্বা দেবে? ব্যাপার দেখে জাহাজের কর্মচারীটির আক্কেল গুড়ুম হয়ে যায়।

শিশির হাতের আংটি খুলে দ্যায়ঃ এতে আমাদের টিকিট হয় না? কলকাতা পর্যন্ত টিকিট?

এতেও যদি না হয় আমার সোনার দুল আছে। লিলি কানের দুল নেড়ে বলে।

বলতে গিয়ে দুলের দোলনা জেগে ওর সোনালী মুখ লাল হয়ে ওঠে।

॥ রেঙ্গুনী জাহাজের দরদস্তুর ॥

জাহাজের কর্মচারীটি আংটিটা অঙ্গুলিগত করে বললেন, তোমাদের কিন্তু তলাকার ডেকে থাকতে হবে। তোমাদের টিকিট নেই কিনা।

খুব রাজী; ঘাড় নেড়ে জানাল শিশির।

জাহাজের উপরে ডেকে যত ডেক প্যাসেঞ্জার—সাধারণ যাত্রী যত। তার থেকে একটা থাক আলাদা করা—বেশী ভাড়ার যাত্রীদের জন্যে;—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কেবিনের সারি। তার নীচের ডেকটায় যত মালপত্র বোঝাই।

সেই মালঞ্চের অন্তরালে—মালের সামিল হয়ে এক কোণে শিশির ও লিলির জায়গা করে দেয়া হোলো।

এই খেনে তোমরা লুকিয়ে থাকবে, বুঝলে? সাবধান, উপরের ডেকে গিয়ে উঁকি-ঝুঁকি মেরনা যেন। কর্মচারীটি বিশেষ করে ওদের বলে দিলেন। গতিবিধির ত্রুটি-বিচ্যুতিতে যদি ইতর বিশেষ ঘটে, যদি ওরা ধরা পড়ে ফের তখন আর উঁনি ঝুঁকি নিতে পারবেন না, সে কথাও বাতলে দিতে কসুর করলেন না।

না না উঁকি ঝুঁকি মারব কেন? বলল লিলি: ও সব খারাপ কাজে আমরা নেই।

অলঙ্কৃত আঙ্গুলটি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে কর্মচারীটি বলল: এতো গেলো তোমাদের রেঙ্গুন পর্যন্ত যাবার ভাড়া। তারপর রেঙ্গুন থেকে একীয়াব—আচ্ছা সে তখন রেঙ্গুনে গিয়ে দিলেই হবে।

এই বলে লোকটি লিলির কানের দিকে প্রলুব্ধ চোখে তাকায়। আমার দুল তো আছেই। তাই দেব। পরবর্তী ভাড়ার ভার লিলি নিজের স্বকর্ণে অর্পণ করে।

হ্যাঁ, তোমার দুলতো রয়েছেই। আমি সেই কথাই বলছিলাম। কর্মচারীটি খুশী-খুশী মুখ হাসি হয়ে ওঠে: তোমাদের মত ভালো ছেলে মেয়ের কাছে আবার ভাড়ার জন্য ভাবনা।

কেন, দুল কেন? আমার ফাউন্টেন পেন নেই? শিশির নিজের ফাউন্টেন পেন দেখায়।

ফাউন্টেন পেনটা হাতে নিয়ে নেড়ে চেড়ে লোকটি বলে: উহুঁ, এই কলমে রেঙ্গুন থেকে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া পোষাবে না। এ কী কলম? এতো পার্কার নয়। শেফারও নয় তো। এতো দেখছি আড়াই টাকা দামের জাপানী পাইলট পেন। পার্কার ডু ফ্লোড হলেও না হয় দেখা যেত চেষ্টা করে।

আমার হাত ঘড়ির বদলে হয় না। শিশির নিকেলের রিষ্ট ওয়াচটা স্বহস্তে তুলে ধরে। হাত ঘুরিয়ে উঁচু করে ঘড়িটা দেখায়।

হ্যাঁ, ওটা পেলে হয়তো তোমাদের একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারি। কিন্তু তাহলে তোমাদের আরো নীচে যেতে হবে।

এর তলায় এঞ্জিন-ঘরের পাশে কয়লার ভাড়ারে থাকতে হবে তাহলে। তোমাদের তাতে একটু কষ্ট হতে পারে হয়ত। অবশ্যি এখান থেকে না, রেঙ্গুন থেকে বলছি।

বারে! তা কেন, আমার দুল আছে তো। লিলি আবার জ্বলে ওঠে। থাকলেইবা দুল নিয়ে অত টানা টানি কিসের? শিশির লিলির দাতাকর্ণ তায় বাধা দ্যায়ঃ আচ্ছা, যদি আমার ঝরণা কলম আর হাত ঘড়ি দুটোই দিই আর—আর যদি। না, তা হয় না!

হ্যাঁ, তাহলে হয়। কর্মচারীটি জানায়।

তাই বলছিলাম লিলি ওপরে এই ডেকে থাক আর যদি আমি যদি কয়লার ঘরে যাই—?

না না না। লিলি চীৎকার করে ওঠে।

তাই তো বলছিলাম, তা হয় না। লিলি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারবে না। আমি পারি, হ্যাঁ, আমি খুব পারি। কিন্তু আমি একলা থাকতে পারলেও ওর মন কেমন করবে কিনা। ও আমাকে ছাড়া থাকতে পারে না। আর আমিও চাই না যে ও আমাকে ছাড়া কখনো থাকে। তাহলে?

তাহলে তোমরা দুজনেই এক সাথে থাকো। তাতে আমার আপত্তি নেই। রিষ্ট ওয়াচ আর ফাউণ্টেন পেন দুটো পেলে আমি তোমাদের দুজনকেই এক সঙ্গে একীয়াব পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারব। কিন্তু তারপর?

তারপরে? তারপরে তো আর কিছু নেই। শিশির বিষণ্ণ গলায় বলে। কিন্তু তার পরেও, একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম রয়েছে। আর আমার দুল জোড়া রয়েছে কি জন্যে? লিলি গরম হয়ে ওঠে। শুনি একবার? লিলি? ও গুলো মার দেয়া—তোমার জন্মদিনের

উপহার। মনে আছে? মার কাছ থেকে কি আমি আর পারবো না? আমার সব জন্মদিন কি ফুরিয়ে গেছে? আমার আরো কতো জন্মদিন আসবে।

ছিঃ লিলি। অমন কথা মুখেও আনিসনে!

মানে? আমার জন্মদিন আসবে না, তুমি বলতে চাও।

না না, ঐ ভুল দেবার কথা। আর যেন ওকথা না শুনি।

তাহলে—একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তার কী হবে? লোকটা মনে করিয়ে দ্যায়। (মেমরী তার ভারী ভালো)

দেখুন, আমার জুতো! খুব দামী জুতো। বাবার কিনে দেয়া। আর আমার সার্টটাও কেমন চমৎকার দেখুন। খুব দামী সিল্ক। এগুলো দিলে হয় না?

ওগুলো? লোকটা ভুরু কুঁচকে নাক সিঁটকে তাকায়ঃ তা হলেও হতে পারে। খুব কষ্ট স্বষ্টেই হবে। আমার মেজ ছেলেটা মাথায় প্রায় তোমার সমান। সে পরতে পারবে। হাফ প্যাণ্টাও দেবে তো? ওটা তোমার তত মন্দ না।

নাঃ হাফ প্যাণ্ট দেয়া যায় না। শিশির সলজ্জ দৃঢ়তার সহিত বলে। আমি তোমাকে একটা গামছা দেব না হয়।

তাহলে হয়ত হতে পারে। শিশির প্রস্তাবটা পুনর্নিবেচনা করে ছাখেঃ বেশ পরিষ্কার গামছা?

পরিষ্কার বই কি? লোকটা প্রলোভনের সামগ্রীটির চতুর্দিক উন্মুক্ত করেঃ একটু আধময়লা এই যা। সারেংদের গা-মোছা কিনা। বলে কয়লা-ঝাড়া ঝাড়ন নয় কিন্তু।

ততটা নিন্দনীয় নয় জেনেও শিশির চুপ করে থাকে—গামছার বাঞ্ছনীয়তাটাই চিন্তা করে বোধ হয়।

লিলি কিন্তু চুপ করে থাকতে পারে নাঃ দাদার প্যাণ্টের বদলে আমার জুতো দিলেও হয় না? ওই পচা প্যাণ্টের চেয়ে এটার দাম অনেক বেশী। আপনার ছোট মেয়ে পরতে পারবে।

লোকটি লিলির শৌখীন জুতোর দিকে কটাক্ষ করে। পাছে লোকটা না বলে বসে কিংবা দাদার দিক থেকে বাধা এসে পড়ে লিলি তাই তক্ষুণি জুতো খুলে ফ্যালে—সেই দণ্ডেই ওদের পদচ্যুত করে ছায়।

জুতো জোড়া হস্তগত করে লোকটা ভ্রূক্ষেপ করে : বাঃ, বেশ বাহারী জুতো তো। মেয়ে কেন—বৌই পায় দেবে'খন।

আমার বর্মী বৌ—তার খুদে খুদে পা।

তাহলে আর তাকে পায় কে। লিলি হেসে ফ্যালে। এই জুতো পায় দেখবেন কেমন খুর খুর করে চলেছে।

হ্যাঁ, তাহলে তুমিও রিস্টওয়াচ ফাউন্টেন পেন—জুতো জামা সব দিয়ে দাও। নিয়ে রাখি এখুনি।

এখুনি ? এখুনি কেন ? এখনো তো আমরা রেঙ্গুনেই পৌছয়নি। রেঙ্গুন থেকে একীয়াব। একীয়াব থেকে চট্টগ্রাম—তখন তো। তখনই দেব। শিশির বলে।

তা কি হয় ? টিকিট লোকে গোড়াতেই কাটে। তাছাড়া তোমরা ছেলেমানুষরা ভারী ছটপটে। তোমরা ঠিক ওপর-নীচ করবে, এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকতে পারবে না। এধারে ওধারে উঁকি ঝুঁকিও মারবে, আমি জানি। আর ধরাও পড়ে যাবে সেটাও ঠিক।

বাঃ তা কেন করব ? ধরা পড়তে যাব কেন ? তাতে তো তোমাদেরই সর্বনাশ।

আর আমারই বা কী পৌষ মাসটা শুনি ? তোমরা ধরা পড়ো তাতে ক্ষতি নেই—তোমরা গোল্লায় যাও না। কিন্তু ওই জিনিষ গুলো সেই সঙ্গে ধরা পড়লে সমস্তই তো গেল। তাতে আমার লাভ ? আর কি তখন ওগুলো আমার হাতে আসবে ? কার হাতে যাবে কে জানে। তখন আমার ক্ষতি পূরণ কে দেবে শুনি ?

অগত্যা শিশিরকে তখনই জামা জুতো হাত ঘড়ি আর ঝরণা-

কলম হাত ছাড়া করতে হয়। শিশিরের থাকে কেবল সেই হাফ প্যাণ্ট আর একটা সামারকুল। জালি—দেয়া গেঞ্জীটার ওপরেও তার নজর পড়েছিল, কিন্তু একটু পরীক্ষা করেই সে ওটাকে বরখাস্ত করে দিল—নাঃ, অনেক কালের গেঞ্জী। তা নইলে এতো ফুটো ফুটো কেন? গেঞ্জীটার আগাপাস্তলা ছাঁদা হয়ে গেছে—হাড় পাঁজরায় ঝাঁঝরা—অপদার্থটিকে বাদ দিয়ে বাকী পদার্থটিকে কুক্ষিগত করে লোকটি সহাস্য হয়ে উঠল—বেশ বেশ। তোমরা চট্টগ্রাম পর্যন্ত পৌঁছুলে আমাদের জাহাজ কিন্তু কলকাতায় যাবে। তোমরাও তো কলকাতাতেই নামবে। তাই না? তা-হলে চট্টগ্রাম থেকে কলকাতার ভাড়া?

সর্বস্বান্ত শিশিরের ওপর দ্রুত বিচরণ করে লোকটার লোলুপ চাহনি লিলির কানের গোড়ায় গিয়ে আটকে যায়।

লিরির দুলের সঙ্গে দোল খেতে থাকে। চট্টগ্রাম থেকে কলকাতা আরো দূর—তার মানে আরও দুরাশা।

আমার দুল? লিলিও দোদুল্যমান।

তুই থাম। তোকে কর্তাত্বি করতে হবে না। তাহলে মশাই, চট্টগ্রামেই আমাদের নামিয়ে দেবেন।

চট্টগ্রামেই নেমে যাবে? লোকটা অবাক হয়।

হ্যাঁ, সেখানেই নামিয়ে দেবেন দয়া করে। সেখান থেকে পায় হেঁটে আমরা বাড়ী যাব।

পায়ে হেঁটে? চাঁটগাঁ থেকে আসাম? লিলি আকাশ থেকে পড়ে—পড়বার সাথে সাথেই তার পা ব্যাথা করতে থাকে। বর্মায় এত দৌড় ঝাঁপের পর আবার আরেক দফা হাঁটাহাঁটি—চট্টগ্রাম থেকে তাদের অট্টালিকা কদ্দূর কে জানে। ব্যাপারটা তার একেবারেই ভালো লাগে না।

পারবি না? এমন কী দূর? শিশির ওকে উৎসাহ দ্যায়ঃ আমাদের মামা যদি আসাম থেকে পদব্রজে বর্মা আসতে পারে

তাহলে আমরা কি চট্টগ্রাম থেকে হাঁটন দিয়ে বাড়ী ফিরতে পারবো না? খুব পারব। এক হাঁটায় মেরে দেব—দেখে নিস।

হাঁটতে হবে না। লিলি বলেঃ সেখান থেকে রেলগাড়ী করেই আমরা বাড়ী ফিরতে পারব। চাটগাঁয় আমার এক পেন ফ্রেণ্ড আছে। সে নিশ্চয় আমাদের সাহায্য করবে।

চাঁটগায় বন্ধু আবার তুই কোত্থেকে পেলি? শিশিরের তাজ্জব লাগে।

চিঠি পত্রের ভেতর দিয়ে।······পেনফ্রেণ্ড বলছিনে? লিলি বলে, পেনফ্রেণ্ডরা কিছু না! বলে প্লেজার ফ্রেণ্ডরাই কোনো কাজে লাগে না তো পেনফ্রেণ্ড। সুসময়ে অনেকেই বন্ধু বটে হয়, অসময়ে হায় হায় কেহ কারো নয়। তোর অভাবের সময়ে কোনো বন্ধুই নেই—বইয়ে পড়িস নি?

আমার বন্ধু সে রকম নয়। লিলি নিজের বন্ধু গুমরে গুমরে ওঠে।

বই ধার চাইলেই বন্ধুত্ব চলে যায়। বই ধার দিলেও যায়—কিন্তু সেই সঙ্গে বইও যায়। আমারও পেনফ্রেণ্ড ছিল রে।

আমিও তাকে দুএকটা ভাবের কথা লিখেছিলাম, তাতেই সে চিঠি লেখা ছেড়ে দিলে। অভাবের কথা কিছু লিখিনি, তবু সে কী ভাবলে কে জানে—হয়ত ভাবলে ভাব জমিয়ে বইটই কিছু ধার নেবার মতলবে আছি।

ছেলেরা আবার বন্ধুত্ব করতে জানে? দূর দূর। লিলি এক ফুৎকারে যাবতীয় হয়ে ওঠে।

হয় তো রয়েই গেলো। আমার কানে কি কিছু নেই? চাটগাঁতেই এটা আমি বেচে দেবো তাহলে। আর কারু কথা তখন শুনব না। পা আমার মাথায় থাক। হাঁটাহাঁটি আমার পোষায় না বাপু।

দুরাশাপরবশ ব্যক্তিটি হতাশ হয়ে তাদের চট্টগ্রামের উপকূল (ভবিষ্যৎ বাচ্যে) পরিত্যাগ করে যাবার পর শিশির-লিলি তাদের এলাকার এধারে-ওধারে ঘুরে ফিরে দেখতে বেরুল।

শিশির লিলিকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ওপরে না গেলেই হোলো। উন্নতির মূল ওই যে সিঁড়িটি দেখা যাচ্ছে ওতে পদার্পণের লোভ সম্বরণ করলেই যথেষ্ট, তাহলেই নিশ্চিন্ত। ওপর থেকে কেউ আর এখানে উঁকি ঝুঁকি মেরে আমাদের দর্শন নিতে আসছে না নিশ্চয়ই।

হাঁটাহাঁটি লিলির ততটা না পোষালেও এক জায়গায় পা জড়িয়েই বা কতক্ষণ থাকা যায়? তাছাড়া, লম্বা লম্বা পা ফেলে ছোট খাট হণ্টন লিলির ভালোই লাগে।

এ ধারে প্যাককরা এক গাদা পার্শেলের বাক্স—আরেক ধারে যত রাজ্যের ফলের ঝুড়ির ডালা উন্মুক্ত, উন্মুখ হয়ে কত রকমের ফল ওদের অভ্যর্থনা করছিল। তাদের দু' এক জনের নিমন্ত্রণ রক্ষা করেছ—এবং তাদের বাঁচিয়ে ডিঙি মেরে মেরে ওদের চলতে হচ্ছিল। শিশির লিলিকে বলল: বুঝেছিস তো! এরাই আমাদের এই কদিনের ফলার। এই সিঙ্গাপুরের কলারা; চট্টগ্রাম অবধি অভিযানের রসদ!

লিলি বলল: যাবার ভাবনাতেই এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলাম। খাবার কথা মনেই পড়েনি।

কর্ম করলেই তার ফল আছে, বাবা বলেন না? তেমনি ফল থাকলে তার কর্মও থাকবে। তবে মুশকিল এ—এত ফল, আর চারটি মাত্তর হাত। বেশী কর্ম করে উঠতে পারব না। এই দুঃখ।

এক জায়গায় আবার বস্তার পাহাড়! বস্তাবন্দী হয়ে সারি সারি কী বস্তুরা দাঁড়িয়ে আছে।—শিশিররা মাথা ঘামানোর চেষ্টা করে। যাই থাক, বস্তা ফাঁক করে দেখার সাহস হয় না। তাদের

নিজেদের—অবস্থা, তাহলে হয়ত সেই পাপে নীচের কয়লার ঘরেই নির্বাসিত হতে হবে। এবং সেখানে খুব যে সুবিধে হবে না, বলাই বাহুল্য; কয়লারা যে কেবল দৃষ্টিকটু তাই নয়—তার ওপরে—যারপরনাই অখাদ্য। এমন ফলতা ছেড়ে কয়লা ঘাটায় কে যায়? মোটা মোটা কাছির দড়ি তালগোল পাকানো—এখানে ওখানে সেখানে কুণ্ডলী করে রাখা। লাফ মেরে মেরে ওরা চলছিল। ডেকের ধারটায় পৌছতেই দু' একটা চাপা গলার আওয়াজ ওদের কানে এল।

অ র্ র্ র্ র্ র্ র্ র্ র্ র্........চেঁচিয়ে উঠল কে যেন। পাঁঠা নাকি? বলল লিলি।

পাঁঠাতো নিশ্চয়; শিশির বলে: কিন্তু দুপেয়ে না চার পেয়ে?

কৌতূহলী হয়ে কণ্ঠধ্বনি অনুসরণে আর একটু এগুতেই—ব্যা—ব্যা—ব্যা। পরিষ্কার ভাষায় ছাগলাদ্য ব্যাকরণ ওদের কানে এল—এবং এর পরেই চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভঞ্জন হতে সংশয়ে তিলমাত্র অবকাশ রইলো না।

ছাগলের পাল তাদের চোখের সামনে। ওমা! এতো ছাগল কেন এখানে? লিলি গালে হাত দ্যায়। জাহাজে করে রপ্তানি হচ্ছে বোধ হয়। শিশির বলে। ডেকের সে ধারটা বেড়ার মত করে ঘেরাও করা—তার ভেতরে অগুণতি ছাগল। ওই অল্প পরিসরের মধ্যে ঠাসাঠাসি বন্দী দশায় বেচারীরা মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল। লম্ফ ঝম্ফ দূরে থাক, স্বভাবসিদ্ধ চেঁচামেচির পর্যন্ত কারো উৎসাহ ছিল না। কেবল ওদের মধ্যে দু'একজন—নেতৃস্থানীয়ই বোধ হয়—বিশুদ্ধ ব্যাকরণে মাঝে মাঝে অসন্তোষ প্রচার করছিল। মুখপত্র কিংবা মুখপাত্র হিসেবে প্রেরণাদানের কর্তব্য পালন মাত্র।

কোথায় এদের বেঁধে চালান দিচ্ছে দাদা?

আমিও তো তাই ভাবছি। কোথায় আবার ছাগল নেই?

কোন মুলুকে ছাগলাভাব? সব দেশেই তো দেদার পাঁঠা খেয়ে খেয়ে ফুরানো যায় না?

মাগো? কি বিচ্ছিরি গন্ধ! লিলি নাকে রুমাল ছায়। ছিঃ, পাঁঠা বলে ওদের অবজ্ঞা করিসনে। পাঁঠা বলে কি মানুষ নয়? একবার ওরাই আমাদের প্রাণ বাঁচিয়েছিল। পাঁঠারা অতি নমস্য ব্যক্তি। শিশির নমস্কারের দ্বারা নিজের কথায় সায় ছায়।

দক্ষ যজ্ঞের গল্প শুনিস নি বাবার কাছে? দক্ষ তার যোগ্যতার কি পুরস্কার পেয়েছিল শিবের হাতে? পাঁঠার মাথা। তার মানে কি? পাঁঠার মত দক্ষ লোক ছনিয়ায় আর নেই। প্রত্যেক যোগ্য লোককে ভালো করে যাচিয়ে ছাখ—দেখবি আসলে একটা পাঁঠা। বাবাই একথা বলে—এবং আমি বাবার সঙ্গে এ বিষয়ে একমত। আমি তো পাঁঠার মাংস পেলে আর কিছু পেতে চাইনে, অমন নিঃস্বার্থপর পরোপকারী জীব পৃথিবীতে আর কে আছে? আমরা ওদের বলিদান করি—তার বদলে ওরা আমাদের বলিদান করে?

পাঁঠা নয়তো বলদ। লিলি এক কথায় বলে দ্যায়। বলতে পারিস, গোরুরা যদি আপত্তি না করে। বাবা বলেন, পাঁঠারা সামান্য নয়। পৃথিবীর সমস্ত কাণ্ডকারখানা কারা চালায়—যুদ্ধ বিগ্রহ যত কারা বাধিয়ে রাখে? পৃথিবীর বড় বড় কাজ কারা করে? পাঁঠারা। ছোটখাট কর্তৃত্বের চূড়া থেকে বড় বড় শাসন চক্রের চূড়ান্তে কারা বসে আছে? হয় একটি—নয় একদল—সেই পাঁঠা। পাঁঠাদের লীলা বোঝা ভার। এক মুখে ওদের মাহাত্ম্য কীর্তন করা যায় না। শিশিরের গম্ভীর মুখে প্রবীণের বুলি।

মানুষের তাহলে মানুষ হবার এখনো ঢের দেরি আছে, কি বলো দাদা? এখনো ওদের পাঠ্যাবস্থা চলছে তাহলে? লিলিও বাবার মুখ থেকে শোনা শক্ত একটা কথা উচ্চারণ করে ছায়।

ফলের ঝুড়ির ওখান থেকে কটমট করে আমাদের দিকে চাইছে ও লোকটা কেরে? শিশির চকিত হয়ে ওঠে।

এইমাত্র ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল না? হুঁ। দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে! শিশির রবীন্দ্রনাথের পংক্তি দিয়ে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করে।

গ্র্যাণ্ড মামার আড্ডায়। লিলির মনে হয়। ঠিক ধরেছিস। গ্র্যাণ্ড মামাদের দলের কোনো লোক। তা না হয়ে যায় না। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে মনে হচ্ছে।

তাহলে—তাহলে কি হবে? লিলি শঙ্কিত হয়ে ওঠে।

নিশ্চয় ও একা নেই এখানে। গ্র্যাণ্ড মামার দলবল সবাই এই জাহাজেই যাচ্ছে তাহলে। ওদের তো পরশুদিন পাড়ি দেবার কথা শুনেছিলাম—তাহলে আজকেই—চলল কেন? য়্যাঁ?

আমাদের ধরবার জন্য নাকি? নিজেরা ধরা পড়বার ভয়ে। পুলিশের তাড়ায় বোধ হয়। গ্র্যাণ্ড মামাও নিশ্চয় এই জাহাজে চলেছে।

কিন্তু লোকটা অমন রেগে মেগে তাকাচ্ছে কেন দাদা? শিশিরকে এর উত্তর দিতে হয় না—লোকটা নিজেই প্রকাণ্ড একটা ছোরা হাতে, বোধ হয় সমুচিত প্রত্যুত্তর দেবার উদ্দেশ্যেই ওদের দিকে এগুতে থাকে।

॥ পাঁঠায় পাঠায় হোলো ধুল পরিমাণ ॥

লোকটা ছুরিকা হস্তে, রজনীর মত, ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে। শিশির আর লিলি চারধার অন্ধকার দ্যাখে—সেই আঁধারের মধ্যে কেবল সেই ছুরিখানার চাকচিক্যই তাদের চোখের সামনে ভাসতে থাকে।

কই? কই সেই গুপ্তধন? কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস বের কর। লোকটার প্রথম কথাই কাজের কথা। বাজে কথার লোক সে নয়,

বৃথা বাক্য ব্যয়ের সময় তার বিরল—ছুরির ইঙ্গিতেই তার যথেষ্ট প্রমাণ সে ছায়।

এই তো। হাফ্‌প্যান্টের দুই পকেট থেকে রত্নডিম্ব দুটিকে উদ্ধৃত করে তুলে ধরে শিশির।

এই দুটো? দুটো কেবল? আর সব কই?

আর। আর তো সব গ্র্যাণ্ড মামার কাছে।

গ্র্যাণ্ড মামা? সে আবার কোন ছুঁচো?

ছুঁচো কিনা জানিনে—তার নাম বক্কেশ্বর আইচ্‌।

ইয়ার্কি হচ্ছে? তিনি তো আমাদের দলের সর্দ্দার। তার সঙ্গে কী সম্পর্ক তোদের? খেঁকিয়ে ওঠে লোকটা।

মামাতুত সম্পর্ক। তিনি আমাদের মামার মামা। তিনিই তো এই দুটো আমাদের প্রেজেণ্ট দিয়েছেন।

প্রেজেণ্ট দিয়েছেন। হাতের ছুরিখানা আমূল নিজের বুকে বিদ্ধ হলেও লোকটা বোধ করি এতখানি আহত হোতোনা। তিনি প্রেজেণ্ট দিয়েছেন তোমাদের। বিমূঢ় কণ্ঠে সে বল্লে। তার হাতের ছুরিখানা—না হাত থেকে হয়—হাত সমেত খসে পড়ে। হাত লাগাও হয়ে হাঁটুর কাছে ঝুলতে থাকে।

তিনি ছাড়া আবার কে দেবে। কার দেবার ক্ষমতা? বলে শিশির। সে কথাও তো মিছে নয়। তাদের কর্তা ছাড়া এই ব্যাপারে ক্ষমতাবাণ আর আর কারো কথা সে কল্পনা করতে পারে না। কিন্তু তিনি নিজে-স্বহস্তে—এই লোভনীয় মনিরত্ন,—নিজের কাছে না রেখে, নিজের অনুচরদের না দিয়ে—কোথাকার কোন ভাগনের ভাগীদারকে ডেকে বিলিয়ে দেবেন এমন পরমাশ্চর্য কথাও তো ধারনা করা কঠিন। কিছুটা বিশ্বাস—কিছুটা অবিশ্বাস—আর সমস্তটাই বিস্ময়ে ওতোপ্রোত হয়ে সে বলে: তবে যে তিনি বললেন তোমরা বাগিয়ে নিয়ে পালিয়েছ।

তা কি করে হয়? লিলি বলে ওঠে এখন: আমাদের গ্র্যাণ্ড

মামা কতো বড়ো আর কী জোয়ান—আর আমার দাদা কত ছোট্ট—কত্তটুকু। সে কি কখনো তার হাত থেকে কিছু কেড়ে নিতে পারে?

সেও তো একটা কথা। লোকটার মুখ দেখে মনে হয় সে যেন আরো বেশী মর্মাহত হয়েছে। তার মুখ থেকে প্রতিবাদ আসে না।

শিশিরের মুখ থেকে আসে: তুই যে কী বলিস লিলি। আমি বুঝি আর বড়ো হইনি? আমি বুঝি আর জোয়ান নই? কী যে বলিস তুই।

তাহলেও, আমার দাদা ছোটো জোয়ান তো। লিলি দুই দিক বজায় রাখার চেষ্টা করে—দাদার অভিমান এবং দাদা—দুই কূল বাঁচিয়ে রাখতে চায়: সেটা তো তুমি মানবে। একটা ছোট জোয়ান—তো সে যত বড়ই জোয়ান হোক—আসলে একটা বড়ো জোয়ানকে কি গায়ের জোরে হারিয়ে দেবে?

দেবেই তো। দিয়েছেই তো। শিশির বক্ষের বিস্তৃতির ওপরে বাহুর স্ফীতি আমদানি করে আনে: হাতের মাস্‌ল ফুলিয়ে বলে: তা না হলে এগুলো এই স্ত্রীহস্তে এল কি করে শুনি?

এই অযাচিত বীরত্ব লিলির ভালো লাগে না—ঝুলন্ত ছুরিখানা থেকে তখনও আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। অকাল যৌবনের ফলে অকাল বার্দ্ধক্যের আগেই দাদার অকাল মৃত্যু না ঘটে যায় এই ভয়ে সে শিটিয়ে ওঠে: আহা, তুমি গ্র্যাণ্ড মামাকেই গিয়ে জিজ্ঞেস করো না বাপু—তিনিই এগুলো দাদাকে প্রেজেণ্ট দিয়েছেন কিনা। তাহলেই তো ফুরিয়ে যায়। তিনিও এই জাহাজেই প্রেজেণ্ট আছেন তো।

এই কথাটাই এতক্ষণ ধরে লোকটার মনে গুমরে গুমরে উঠেছিল—এইসব চেয়ে বেদনাদায়ক কথাটা—আলপিনের চেয়েও তীক্ষ্ণতর—ছুরির চেয়েও মর্মভেদী এই উপলব্ধি। সর্দ্দার হয়ে নিজের দলবলের সঙ্গে তিনি ছলনা করবেন—তাদের ন্যায়সঙ্গত

ভাগ ন্যায্য থেকে বেদখল করে এভাবে বরখাস্ত করবেন, এই আইডিয়া বরখাস্ত করতেই তার প্রাণে ব্যথা লাগছিল। অন্ত-রঙ্গদের সাথে এই ধরনের রঙ্গ, নেতৃস্থানীয় তাঁর কাছ থেকে অন্ততঃ আশা করা যায় না। এই কি তার নেতৃসুলভতা?

লাঞ্ছিত কুকুর যেমন করে ল্যাজ গুটিয়ে নেয়, সেই ভাবে ছুরি-খানাকে নিজের অন্তর্গত করে লুকিয়ে নিয়ে ম্লানমুখে লোকটা উন্নতির পরাকাষ্ঠা সেই সিঁড়িটা ধরে ওপরের ডেকে রওনা হয়।

একটু পরেই গ্র্যাণ্ড মামা—অধোগতির উপায়—সেই সিঁড়িটা দিয়েই হন্তদন্ত হয়ে ছুটে আসেন।

তোমরা করেছ কি? হাঁফাতে হাঁফাতে তিনি বলেন: কী সর্বনাশ করেছ বলো দেখি?

সর্বনাশ। কেন, কি হয়েছে? ওদের চোখ বড়ো হয়ে ওঠে: আপনাকেও ছুরি নিয়ে তাড়া করেছে না কি?

আমাকে। আমাকে আর তাড়া করতে হয় না। তারা দল বেঁধে তোড়জোড় করে তোমাদের তাড়া করতেই আসছে। তবে তোমাদের কাছে হতাশ হলে—হয়ত আমাকেও তাড়া করতে পারে বলা যায় না।

তা হলে তো মুশকিল। ওদের কণ্ঠে অকৃত্রিম সহানুভূতি। মুশকিল বই কি। তোমাদের কাছে মোটে দুটি রত্ন—আর আমার রত্ন অনেকগুলি।

দুটি নিয়ে কি তারা তুষ্ট হবে! তখন চটে মটে কি করে বসে বলা যায় না, তোমরা এক কাজ করো, ওধার দিয়ে—ওধারের একটা সিঁড়ি আছে—তাই ধরে গা ঢাকা দিয়ে আমার কেবিনে চলে এসো। দশ নম্বর কেবিন—ওপরে বাঁ ধারে। সেখানে এই ক'দিন তোমাদের লুকিয়ে রাখব। হাজার হোক, তোমরা আমার ভাগনের ভাগনে। যতই বজ্জাত হও, বংশ লোপ হতে দিতে পারিনে তো।

আমি পালালুম। তারা এসে পড়ল বলে। তোমরা ওধার দিয়ে চলে এসো চটপট। এই বলে গ্র্যাণ্ড মামা সিঁড়ি দিয়ে সর সর করে উঠে গেলেন।

যাই বল, গ্র্যাণ্ড মামা লোকটা যতই দুষ্টু হোক, আসলে কিন্তু খুব ভালো। শিশির দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে জানায়।

ওধারে উক্ত উন্নতির সোপান ঘেঁষতে গিয়েই দেখা যায় সেই পথেই গ্র্যাণ্ড মামার রত্নগুলি দুদ্দাড় করে নেমে আসছে। লিলিরা আর কোথায় পালাবে—একেবারে জাহাজে রেলিং এর ওপরে গিয়ে জলে ঝাঁপ দিয়ে পালানোর যা একমাত্র উপায়।

নেপোলিয়ন কর্সিকা থেকে লম্বা এক সাঁতারে ফ্রান্সে গিয়েছিল—না রে? জিজ্ঞেস করে শিশির।

লিলি চুপ করে থাকে—শিশির যে নেপোলিয়ন নয়, সে কথা জানাবার তার সাহস হয় না। তাহলে চাই কি, সেই দণ্ডেই হয়ত শিশির, অন্ততঃ জলযুদ্ধে, নিজেকে নেপোলিয়ন প্রতিপন্ন করতে প্রস্তুত হবে।

মৌলমীন থেকে আমরা কতটা এসেছি? ক' মাইল বল তো? এখান থেকে রেঙ্গুন সাঁতরে যাওয়া যায় না কি?

লিলি একেবারে নিরিবিলি।

গেলে তোকে অবশ্যি পিঠে চাপিয়ে নিয়ে যাব, তুই ভাবিস নে। তোকে ফেলে যাব না নিশ্চই। শিশির ওর ভাবনার কারণ দূর করে: আমি কি ভালো সাঁতার জানিনে, নাকি? বলি, গ্র্যাণ্ড মামাকে সলিল সমাধি থেকে উদ্ধার করেছিল কে? কে শুনি?

লিলি ভরসান্বিত হয় কি না বলা যায় না, কিন্তু মতামত প্রকাশের আগেই ডাকাতরা ওদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়ে।

ছাখো, তোমরা যদি আর এক পা এগিয়েছ, আমি তা হলে এক্ষুণি আমার এ দুটো কী, দেখছত?—এক্ষুণি এগুলি ছুড়ে সমুদ্রের মধ্যে ফেলে দেব।

শিশির বেঁকে দাঁড়ায়।

সাত রাজার ধন এক মানিক। সবিস্ময়ে সমস্বরে ওরা বলে উঠে।

এক নয় দুই মানিক। শুধরে দেয় শিশির। বলতে পারো বরং। জলে ফেলে দেবে? ওরা চমকে যায়---যদিও সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারে না—তবুও ওরা থমকে দাঁড়ায়। আর এক পা এগোয় না। একেবারে জলাঞ্জলি দেব। শিশিরের কণ্ঠে কুণ্ঠার লেশ নেই।

তা হলে? তাহলে তোমাদের ধরতে না পারলে আমরা ওগুলো পাব কি করে? হাতাবো কি করে শুনি?......এ কি রকম কথা?

তার আমি কি জানি। শিশির যেন তাদের নাগালের বাইরে এক সামুদ্রিক চড়ায় গিয়ে চড়াও হয়েছে—এমনি তার চড়া গলা।

আচ্ছা, এক কাজ করলে হয় না?—ওদের মধ্যে মোটা সোটা মত একজন এক উপায় বাতলায়ঃ তার চাইতে তুমি মানিক দুটো আমার হাতে দাও—আমি না হয় তোমাদের দুজনকে তুলে জলে ফেলে দিচ্ছি। তাহলে হয় না?......জলে ফেলা নিয়ে তো কথা?

ইয়ার্কি পেয়েছ? ধমকে ছায় শিশির।

তাহলে কি অনন্তকাল ধরে আমরা এই রকম স্থির হয়ে এইরূপ মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকব।

একটু আগে যে ছুরি বাগিয়ে এগিয়ে এসেছিল তারই ক্ষুব্ধ কণ্ঠ থেকে এই প্রশ্ন বেরয়।

বেশীক্ষণ নয়, এই যতক্ষণ পুলিশ অথবা রেঙ্গুন এই দুটোর একটা এসে পড়ছে ততক্ষণ একটু কষ্ট করে দাঁড়াতে হবে বৈকি শিশির। কিন্তু কতোক্ষণ আর?

পুলিশ। নামোচ্চারণেই ওদের মধ্যে শিহরণ খেলে যায়— দেহে মনে চাঞ্চল্য দেখা দেয়।

অথবা রেঙ্গুন। শিশির ওদের আশ্বস্ত করতে চায়ঃ রেঙ্গুনও আসতে পারে। যদিও কোন্‌টা আগে আসবে বলা কঠিন।

কিন্তু ততক্ষণই বা কি করে ওই সব বদ্খত নিজের চোখের সামনে দাঁড়িয়ে সহ্য করা যায়? আর অতক্ষণ ধরে দণ্ডায়মান হয়ে থাকাও তো চাট্টিখানি নয়। ঘুম পেলে?

দাঁড়াও, আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। তোমরা চি-বুড়ি খেলা জানো? সে জিজ্ঞেস করে। ঘাড় নাড়ে তারা। বুড়ি জিনিসটা তাদের জানা বটে—মেয়েরা বুড়ো হলে যা হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু তা তো খেলা ধূলার বাইরে।

উঁহু সে বুড়ি নয়। ভেবে ছাখো, আমার হাতে এই দুটি মাত্র মানিক—আর তোমরা এতগুলি সৎপাত্র। কাকে রেখে কাকে দেয়া যায়? তার চেয়ে এক কাজ করা যাক—খেলাটা তোমাদের আমি সমঝিয়ে দিচ্ছি। এই লিলি হলো গিয়ে বুড়ি—ওই সিঁড়ি-টার কাছে গিয়ে দাঁড়াক। আর তোমরা ওই ধার থেকে—যে ধারটায় ছাগলরা আটকানো আছে—ওখান থেকে এক এক বারে একজন করে চি দিয়ে আমাকে ছুঁতে আসবে। আমি পালিয়ে পালিয়ে যাব—যে এক দমের মধ্যে আমাকে ছুঁতে পারবে এই মানিক দুটো তার হবে। আর দম ফুরিয়ে গেলে আমি যদি তাকে ছুঁয়ে দিতে পারি তা হলে সে মরা। তার খেলা ফুরিয়ে গেল, সে আর মানিক পাবে না। কেবল আমি ছোঁবার মুখে সে যদি ছুটে গিয়ে বুড়িকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে তবেই বাঁচোয়া। পালিয়ে নিজের কোঠায় পৌঁছে গেলেও অবশ্যি বেঁচে গেল। তখন সে আবার চি দিতে পাবে। চানস পাবে আবার। কেমন এতে তোমরা রাজী আছো?

দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে দৌড়া-দৌড়ি ভালো—ঢের বেশী মজার, এক কথায় তারা রাজী হয়ে গেল। আর তা ছাড়া, এ ভাবে মানিকটা হাতে এলে অপর কারো সাথে ভাগ বখরা করতে হবে না—ঢের ফ্যাসাদ বেঁচে যাবে—সেও এক মস্ত সুবিধা।

চি-বুড়ি খেলা শুরু হতে দেরি হয় না। প্রথম একজন চি দিয়ে তার গণ্ডী থেকে ছুটে বেরিয়ে আসে—কিন্তু শিশির খুব হুঁশিয়ার। দৌড়ে ধরা তাকে সহজ নয়। ফলের ঝুড়ি পার্শেলের বাক্স সে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়—বস্তাদের ওপর দিয়ে টপাটপ চলে যায় —আর চি-ওয়ালা তীক্ষ্ণ সুরে সুরু করে বটে কিন্তু শেষটায় চিঁ-চিঁ করতে থাকে—ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে বাতাসে মিলিয়ে যায়। তখন আবার শিশিরের উল্টে তাড়ার পালা আসে। শিশিরের তাড়নায় তার তখন পালানোর পথ নেই। কেউ বা ফলের খোসায় পিছলে পড়ে, কারো বা পার্শেলের বাক্সে ধাক্কা লাগে, কেউ বা ঝুড়ির টক্করে জখম হয়ে বস্তার পাহাড়ে গিয়ে আটকে যায়। আর ধরা পড়লেই মরা।

একে একে ওদের সাতজন এইভাবে শিশিরের হাতে মারা পড়ল। ম্লান মুখে পাঁঠাদের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের মধ্যে গিয়ে বসে রইল তারা—পাঠশালার বেড়া ঠেসান দিয়ে। নিজেদের বাদ বাকীদের মৃত্যু কামনা ছাড়া আর কোনো কামনা তাদের মনে নেই।

বাকী সাতাশ জনেরও সেই দশা হোলো। পূর্বগামীদের আন্তরিক প্রার্থনাতেই কি-না বলা যায় না।

আর একজন কেবল তখনো বেঁচে—পেল্লায় রকমের নাদুস নুদুস একজন। বেচারা দু-একবার এর মধ্যে চি দিয়ে এসেছিল—কিন্তু ওর চি বেশী দূর এগোয় নি। ও নিজে তার চেয়ে আরো কম এগিয়েছে।

সেই হৃষ্ট পুষ্ট লোকটি বলে: আমি অত দৌড়তে পারব না। হাত দিয়ে ছোঁয়া আমার পোষাবে না বাবু। আমি বাঁশ দিয়ে ছোঁব। এই লম্বা বাঁশটা দিয়ে।

এই বলে শিশির তার প্রস্তাবে রাজী কিনা জানাবার আগেই বাঁশ সে খুলে নিল। তার পরে সেই বাঁশখানা স্বহস্তে ধরে—

শিশিরের দিকে বাড়িয়ে—চি—দানের উপক্রম করল সে। কিন্তু উপক্রমের সূত্র পাতেই হুলুস্থূল।

এই লিলি, দেখছিস কি। সিঁড়ি দিয়ে উঠে পড়—চটপট। ছাগলরা ছাড়া পেয়েছে দেখছিস নে? শিশিরের চীৎকার শোনা যায়।

মুক্তি পেতেই, ছাগলের পালের উৎসাহ ছাখে কে। ডেকের ওপর দিয়ে ছাগলের তরঙ্গ যেন ছুটে আসতে লাগল। আর গোড়ার ধাক্কাতেই বেড়ার ঠেসান দেয়া বীরেরা ভেসে গেলেন প্রথমে। লিলি ওধারের সিঁড়ির উপরে উঠে দাঁড়িয়েছে—শিশির এ ধারের।

ছাগলের খরস্রোত চারধার প্লাবিত করে চল্ল। আর গ্র্যাণ্ড মামার দলবল—মায় সেই বংশধারী স্থূলকায় পর্যন্ত—সেই স্রোতের মুখে বেকায়দায় পড়ে ভাসতে ভাসতে চলল। ঢেউয়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতই।

তাদের কেউ কেউ যে স্রোতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেষ্টা করেনি তা নয়—কিন্তু তোড়ের মুখে পারবে কেন? দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই গুঁতো মেরে তাদের শুইয়ে ভেসে চলেছে। বাঁশ হাতে সেই মোটা লোকটাও ভাসতে দ্বিধা করছে না। তীর বেগে ভেসে যেতে যেতে অবশেষে—তারা—একেবারে জাহাজের রেলিংয়ের কিনারায়—

সর্বনাশ হলো। চেঁচিয়ে উঠল লিলি।

এই যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? শিশির উচ্ছ্বাসে আনন্দমঠ হয়ে ওঠে: হরে মুরারে—হরে মুরারে॥

বঙ্কিম কটাক্ষে সমস্ত দৃশ্যটা দেখতে দেখতে বঙ্কিমের আনন্দমঠ তার মনে পড়ে।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ। লিলিও আওয়াজ ছাড়ে—সেও কিন্তু কম যাবার মেয়ে নয়।

রেলিংয়ের কিনারায় এসে সে এক দারুণ সংঘর্ষ—ওধারে সমুদ্রের

দুর্দান্ত কল্লোল—এধারে ছাগলদের উত্তাল তরঙ্গ—মাঝখানে ছত্রভঙ্গ গ্র্যাণ্ড মামার দলবল। ছাগলাস্ত ঢেউয়ের ধাক্কায় রেলিংয়ের ওপর গিয়ে বারম্বার তারা আছড়ে পড়ছে—

দেখতে দেখতে রেলিংয়ের খানিকটা মড়মড় করে ভেঙ্গে পড়ল। এবং তারপরে আর দেখতে হোলো না। পঁয়ত্রিশটি বীরের একজনেরও আর টিকি দেখা গেল না। সবাই হুড়মুড় করে সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে পড়ল। পেছনে পেছনে পাঁঠারাও প্রাণ তুচ্ছ করে ঝাঁপ দিতে লাগল। একটাও পিছু ফিরে তাকাল না। রক্ষা পেলনা কেউই। এমন কি সেই হৃষ্ট পুষ্ট বলিষ্ঠ লোকটি পর্যন্ত সবংশে লোপ পেয়ে গেল।

—* শেষ *—